বুদ্ধের দিব্যদৃষ্টি
ও
আজীবক উপক

ভিক্ষু সত্যপাল

গ্রন্থ-শীর্ষক	:	বুদ্ধের দিব্যদৃষ্টি ও আজীবক উপক
গ্রন্থকার	:	অধ্যাপক ডঃ ভিক্ষু সত্যপাল
প্রকাশক	:	সাধারণ সম্পাদক আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্র, বুদ্ধগয়া
উপলক্ষ্য	:	আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্র আয়োজিত গ্রন্থকারের মহাস্থবির বরণ উৎসব
প্রকাশ-কাল	:	০৮.১১.২০০৮
সংস্করণ	:	প্রথম (১০০০ কপি)
কম্পোজিং ও ডিজাইনিং	:	শ্রী সরিৎ বড়ুয়া
কপি-রাইট	:	গ্রন্থকার (সর্বাধিকার)
মুদ্রক	:	সাঁচী প্রেস, দিল্লী দূরভাষ: ৪২১৪১৪৫৭; ৯৩১১৭৯০৫০৪
গ্রন্থকারের অস্থায়ী বাসস্থান	:	C-2 (29-31), Probyn Road (Chatra Marg) University of Delhi Delhi – 110007 (India) Tele: 011 – 27667003 Email: bhante_satyapala@yahoo.com bhantesatyapala@gmail.com buddhatriratnamission@yahoo.com
মুল্য	:	শ্রদ্ধাদান

Printed and donated for free distribution by

The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation

11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415

Email: overseas@budaedu.org

Website:http://www.budaedu.org

This book is strictly for free distribution, it is not for sale.

এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

Suniti Kumar Pathak,
(M.A., P.R.S.)
Kavyatirtha, Sutta-Visarada, Puranaratna
Diploma in Chinese
Former Chairman
Department of Indo-Tibetan Studies
Visva-Bharati University (Retd.)
Ex-Research Professor
The Asiatic Society, Calcutta.

Residence:
Akash-Deep, Abanpalli
Santiniketan- 731235
West Bengal
Phone 03463-262508

অভিমত

আজকাল ভৌতসুখের জন্যে লালায়িত সবাই। একথা অনেকেই অভিযোগ করেন। ভোগসুখের প্রতি মানুষের আকাঙ্খা আছেই। আগেও ছিল, আগামী দিনেও থাকবে। কেননা, জীবের শরীর মাটি, জল, আগুন, হাওয়া আর খানিকটা ফাঁকা জায়গা দিয়ে তৈরী। যেমন, মাংসপেশী, হাড়, ইত্যাদি মাটি দিয়ে গড়া, রক্ত, প্রস্রাব, ঘাম আদি জল থেকে হয়। দেহের তাপ আগুনের পরিচয় দেয়, আর শ্বাস-প্রশ্বাস তো বায়ুর আসা-যাওয়া। আর এই সবের মাঝখানে এদিক ওদিক ফাঁকা শূন্য রয়েছে যার ভারসাম্যে শরীরটা চলে। শরীরটা নিজেই যেখানে পাঁচটা ভৌতিক জিনিষ দিয়ে গড়া সেখানে ভোগসুখের ভৌত দিক থাকবে। তারই তাড়নায় জীব মাত্র ছুটে বেড়ায়। মানুষও ছুটে, অনাগত দিনেও ছুটবে। সেখানে মানুষের সঙ্গে আর পাঁচটা জন্তুজানোয়ারের তফাৎ কি?

কেউ বলবেন, তাই বলে কি মানুষ আর জন্তু-জানোয়ার এক? মানুষের বুদ্ধি আর কুকুরের বুদ্ধি কি এক? সেই কথার জবাব মিলে পূজনীয় ভদন্ত ডঃ ভিক্ষু সত্যপালজীর লেখা 'বুদ্ধের দিব্যদৃষ্টি ও আজীবক উপক' শীর্ষক গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে। পূজনীয় ভদন্ত সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী। তাঁর কাছে উপক ও চাঁপার জৈবভোগের রসাস্বাদন কতকাংশে কল্পিত। তবে বৌদ্ধ শাস্ত্রের বিবরণের আশ্রয়ে রূপায়িত।

যেমন জৈবক্ষুধার আগ্রাস। সেখানে গ্রন্থকার যথেষ্ট সংযত। মানুষের জৈবধর্মের চেতনা আর পাঁচটা জন্তু-জানোয়ারের থেকে কতটা ভিন্ন তা স্পষ্ট দেখিয়েছেন। চাঁপা সুন্দরী, চাঁপার মতই। উপক কৃষ্ণ বর্ণের। চাঁপার রূপের মোহে আজীবক উপক শ্বশুরের মাংস বিক্রীর পেশা গ্রহণ করতে ইতস্তত করেনি। তাতে চাঁপার মন ভরা দেহভোগের আয়োজন উপক ঠিক মত জোগাতে পারে নি। ভোগের চেয়ে ভোগের উপকরণ সব ক্ষেত্রেই বেশি। তাই এখনকার দিনে কনজিউমার কালচারের বিজ্ঞাপনে এত ধরনের মিডিয়া কাজ করছে। চাঁপা ও উপকের জীবনে তা ঘটেনি। তাই স্বাভাবিক ভাবে চাঁপার আদরের 'কালা' একদিন অনন্তজিন নামে এক বন্ধুর খোঁজে আবার পথে বেরিয়ে পড়েছিল।

কে সেই অনন্তজিন? যিনি ভিতর ও বাহির জয় করেন তিনি জিন। জিনের জয়ের কোনো অন্ত নেই! তিনি হলেন, মারজয়ী বুদ্ধ গৌতম। উপক ও চাঁপার কাছে তা স্পষ্ট ছিল না।

এবার পূজনীয় ভদন্ত ডঃ ভিক্ষু সত্যপালজী নিজের জায়গায় এসে যেন স্বস্তি পেয়েছেন। সেখানে লেখক অনুভবী শমথ-বিপশ্যনার আনন্দ-রস আস্বাদ করেছেন। সেই রসের ভাগীদার করতে চেয়েছেন তাঁর পাঠক-পাঠিকাদেরও। যে সুন্দর বাচনশৈলীতে ভগবান বুদ্ধ ও আজীবক সংসার বিরাগী উপকের সংলাপ রচনা করেছেন, তা অনবদ্য। অতি অতি গভীর হোল বুদ্ধের বোধি-জ্ঞান। সেকথা ভগবান বুদ্ধ নিজেই সহম্পতি ব্রহ্মার কাছে প্রকট করেছিলেন। পূজনীয় ভদন্ত সত্যপালজী সেই 'সুদুর্দশ গম্ভীর ধর্ম' অতি কুশলতা নিয়ে অভিনব উপায়ে তা সবার জন্যে বিতরণ করেছেন। তাঁর লেখনীর উপায় কৌশল্য সাধারণের কাছে পরিবেশন করা হয়েছে অতি সুললিত ভাষায়।

ভাষা চলে তার আপনগতিতে কালের গতির তালে তালে। নাম-রূপ, শমথ-বিপশ্যনা, আনাপান-স্মৃতি, স্মৃত্যুপস্থান, কায়ানুপশ্যনা, বেদনানুপশ্যনা, চিত্তানুপশ্যনা, ধর্মানুপশ্যনা ইত্যাদি শব্দ বৌদ্ধশাস্ত্রীয় পারিভাষিক শব্দাবলী। আধুনিক ভাষায় দুর্বোধ্য। কুশলী লেখক নাম-রূপ বলতে পশ্চিমী ভাষায় মাইণ্ড-ম্যাটার বলেন নি। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বৌদ্ধ নাম-রূপের অনুবাদ করে তা জ্ঞানের আকার যে বস্তুগত নয়, তা বিষয়গত সে কথা বলেছেন। আরও অনুস্মৃতি বেদনার অনুস্মৃতি হয় সেদিকের প্রয়োগে দৃষ্টি দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা এসে পড়ে। আজকাল অডিও ভিসুয়ল মিডিয়ার যুগ। নুতন প্রজন্মকে বই-পড়া অভ্যাস কমিয়ে দিয়ে মিডিয়ার ব্যবসায়ীরা ইনফোনেট ওয়েবসাইড করতে অদম্য উৎসাহী। সেখানে কি এত সযত্নে পরিবেশিত বৌদ্ধপারিভাষিক শব্দের তাৎপর্য বাঙালী পাঠক-পাঠিকার কাছে গ্রহণীয় হতে পারবে? নিঃসন্দেহে বলা যায়, তা পারবে। অডিও ভিসুয়াল মিডিয়ায় উপকের শ্মশানের স্মৃতি উজাগর চিত্তের পরিচয় পাওয়া যাবে না। বোধকরি, এখানে সম্প্রতি 'অশোক' ফিল্মের কথা তোলা যেতে পারে। সেখানের দুর্দান্ত অশোকের সুশান্ত ছবি ফোটানোর প্রয়াস বাইরের। অন্তরের পট পরিবর্তন ফিল্মী পটে আনা সম্ভবপর হয়েছে কি? পূজনীয় ভদন্ত সত্যপাল সেখানে সার্থক। কেননা সেখানে বর্ণনীয় বিষয়ের গ্রন্থকারের মনোবিজ্ঞানের সমতা ঘটেছে। তাই, উপকের ভোগের বাসনায় ক্লিষ্ট মন শ্মশানে গিয়েও উপশম লাভ করে নি। ভগবান বুদ্ধ তাকে সংযত হতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেখানেই ভোগসুখবাদের পরাজয়। ইকোলজীর ভারসাম্য হারিয়ে ভোগসুখের লালসায় মানুষ নিজেই নিজের অস্তিত্বের সন্ধান করে চলেছে। গ্রন্থকার তাই তাঁর পাঠক-পাঠিকাকে বৌদ্ধদের জীবনযাত্রার খুঁটি-নাটিতে কতটা ভারসাম্য সচেতন ভাবে রক্ষা করতে

হবে আজীবক উপকের অপটুতায় তা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। সেজন্য গ্রন্থকারের লেখন কুশলতাকে সাধুবাদ দিতে হয়।

গ্রন্থের শেষ অংশটুকু হৃদয়কে স্পর্শ করে তা হোল চাঁপার বিতর্ক-বিচারের উদ্বেগ। ভগবান বুদ্ধের শরণ লাভে তার উপশম। সেখানেই মানুষের জৈবতা থেকে উত্তরণ ঘটে। অথচ গ্রন্থকার পটুতার সঙ্গে উপকের চিত্রায়ণ করেন নি। তবে সমগ্র গ্রন্থটি অতি আধুনিক প্রয়োজনায় সিদ্ধ হয়েছে।

পূজনীয় ভদন্ত এই উপায় কুশলতা বাঙালী ভাষা জানা সবার কাছে আদরের হবে, সে বিষয়ে সবার মঙ্গল ভাবনায় গ্রন্থকার এই কাহিনী সম্পাদন।

তারিখ : ২৩/১১/২০০৫

সুনীতি কুমার পাঠক
অবনপল্লী, শান্তিনিকেতন প. ব.
পিন - ৭৩১২৩৫

ভূমিকা

'উপক' নামটি বৌদ্ধ সাহিত্যে রাহুল, আনন্দ, সারিপুত্র, মৌদ্গাল্যায়ণ, মহাকাশ্যপ, অঙ্গুলীমাল আদি স্থবির- মহাস্থবির বা অগ্রশ্রাবক-মহাশ্রাবকগণের নামের ন্যায় অতটা চর্চিত নয়। এ কারণে বৌদ্ধ সমাজেও 'উপক' চরিত্রটি আজও অপরিচিত প্রায়। সমগ্র পালি পিটক সাহিত্যে বড় জোর দু-তিনটি প্রসঙ্গেই 'উপক' চরিত্রটি চর্চিত হয়েছে। প্রথমবার চর্চিত হয়েছে বিনয়পিটকের অন্তর্গত মহাবর্গের বোধিকথায়।

সদ্য বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর ধর্মচক্রপ্রবর্তনের উদ্দেশ্যে বারাণসী যাবার পথে উরুবেলা (বোধিমণ্ডপ) ও গয়ার মাঝপথে এ আজীবক উপকের সাথে শাস্তা বুদ্ধের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। শাস্তার অপরূপ দৈহিক দিব্য আভায় উপক চমৎকৃত না হয়ে পারে নি। শাস্তার পরিচয় জানতে চেয়ে উপকই প্রথম কথা পেতেছিল। তার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে শাস্তা একটি গাথা উচ্চারণ করেছিলেন মাত্র। সেই বাহানায় শাস্তা তাকে কোন প্রকারের উপদেশ দেন নি। পরিচয় প্রদান- সূচক প্রারম্ভিক আলাপের পরই শাস্তা অযথা কালক্ষেপন না করে গয়া অভিমুখে প্রস্থান করেন। আর উপক প্রস্থান করেন উরুবেলার দিকে।

স্বল্পকালীন এ সাক্ষাতের আশু পরিণাম উপকের উপর যে পড়ে নি তা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে। শাস্তা কোনকালেই অযথা কালক্ষেপন করতেন না। অযথা কাউকে কোন উপদেশ দিতেন না। সঠিক পাত্রে, সঠিক স্থানে এবং সঠিক কালে তিনি উপদেশ দিতেন। প্রয়োজনে তিনি শ্রোতার মনোদশা বুঝে সবিস্তার উপদেশ দিতেন। আবার প্রয়োজনে তিনি শ্রোতা যতদূরেই থাকুক না কেন তৎক্ষণাৎ পৌঁছে সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত, উপদেশ শুনিয়ে আসতেন। আবার কখনও তিনি

বীজরূপী সংক্ষিপ্ত উপদেশ শুনিয়ে ভবিষ্যতে পরিপক্ক পরিস্থিতির উৎপত্তি হবার প্রতীক্ষা করতেন। তাঁর উপদেশ দান জনিত কর্মের তাৎকালিক বা দীর্ঘকালিক পরিণাম শ্রোতার জীবনে অবশ্যই হতো। উরুবেলা হতে বারাণসী যাবার আরও তো পথ ও পন্থা ছিল। বোধিমণ্ডপ হতে আকাশ-পথে সরাসরি তিনি বারাণসী যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে প্রথম পর্যায়ে উরুবেলা হতে পায়ে হেঁটে গয়া, আর পরবর্তী পর্যায়ে আকাশ-পথে কাশী যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কেন? এ পথে উপকের সাথে সাক্ষাৎ ঘটানোর কোন পূর্ব পরিকল্পনা কি শাস্তার মন-মস্তিষ্কে ছিল? ঐ যাত্রায় উরুবেলা ও গয়ার মাঝে ভগবান বুদ্ধ ও আজীবক উপকের সেই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ হয়। ঐ সাক্ষাৎ কালে শাস্তা তাঁকে নিজ পরিচয় দান ছাড়া আর কোন উপদেশ দেন নি। মূল পিটকের গ্রন্থাদিতে ঐ আজীবক উপকের চর্চা অন্যান্য মহাশ্রাবক স্থবির-মহাস্থবিরগণের ন্যায় তেমন হয় নি। তবে কি উপক ও বুদ্ধের ঐ সাক্ষাৎ একেবারে নিরর্থক ছিল? ঐ আজীবক উপকের হল কি? পরে কি কখনও তাদের উভয়ের মধ্যে আবার সাক্ষাৎ হয়েছিল? দেখা যদি হয়ে থাকে তবে ঐ সাক্ষাতের পরিণাম কি হয়েছিল? প্রশ্নগুলো কেন যেন আমায় নালন্দায় অধ্যয়ন কালেই খোঁচাতো। অধ্যয়নের ব্যস্ততায় ওসবের সমাধান তখন পাই নি।

স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন শেষে নালন্দা হতে বুদ্ধগয়ায় আসি। সেখানে আমার দীক্ষাগুরু পরম শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপাল মহাস্থবির কর্তৃক বুদ্ধগয়ায় প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্রের (I.M.C.) পুরানো কেন্দ্রে চার বছর (১৯৭৫ হতে ১৯৭৯) অবস্থান কালে কর্মব্যস্ত জীবনের ফাঁকে ফাঁকে পালি সাহিত্য অধ্যয়নের অবকাশ খুঁজতাম। অবকাশ পেলেই পিটকের পাতা উল্টোতাম। সমস্যার সমাধান প্রতি পাতায় অবশ্যই পাই নি। তবে পাতা উল্টোনোর কাজ মোটেই ব্যর্থে যায় নি। যতবার

পাতা উল্টেছি কিছু না কিছু নতুন তথ্য অবশ্যই উদ্ঘাটিত হয়েছে। অজানাকে জানার আনন্দে বিভোর হয়েছি বহুবার।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে ত্রিপিটকে বর্ণিত সূত্রগুলো কোন এক স্থানের এক ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমূহ বিশেষকে উদ্দেশ্য করে শাস্তা কর্তৃক উপদিষ্ট হয় নি। বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহকে লক্ষ্য করে শাস্তা ঐ সব সূত্রের উপদেশ দিয়েছিলেন। এমন সব সূত্রের মধ্যে কয়েকটির গহন অধ্যয়নে এদের পাত্র-পাত্রীদের পারস্পরিক যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। ত্রিপিটকে বেশ কয়েকটি উপকের জীবনী থাকায় আজীবক উপকের চরিত্র ও জীবনী খুঁজে পেতে একটু কষ্ট হয়েছে বৈকি। যা হোক্ ধৈর্য হারা না হয়ে কয়েকটি সূত্রের অন্তর্নিহিত যোগসূত্র স্থাপন করতে গিয়ে দেখি এই উপকের জীবনচরিত, উপক ও ভগবান বুদ্ধের ঐ সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতের মূল কারণটি একদিন হঠাৎ উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে। অজানাকে জানার আনন্দে মন যেন আল্হাদে আটখানা। কিছু যেন দুর্লভ পেয়েছি। সেদিন বলতে ইচ্ছে হয়েছিল- 'শোনো রে ভাই, শোনো'। `I got it. I got it'. 'পেয়েছি ভাই, পেয়েছি।' ইউরেকা, ইউরেকা।'

আজীবক উপকের চরিত্রের আদ্য-অন্ত পাঠ করার পর চিন্তা হয়েছিল- শাস্তা যদি পায়ে হেঁটে না গিয়ে আকাশ-পথে বারাণসী যেতেন তবে ঐ আজীবক উপক শাস্তার দেখা পেতেন না। ঐ সাক্ষাৎ না হলে আজীবক উপকের জীবন দুর্বিসহ হত। মুক্তির রসাস্বাদন হতে সে চিরবঞ্চিত থাকতো। শুধু উপকই নয়, সাথে তার পত্নী চাঁপাও এ মুক্তির রসাস্বাদন হতে বঞ্চিত থাকতো। এ সব তথ্যের উদ্ঘাটনে এক নিকর্ষে পৌঁছাই। ভগবান বুদ্ধ ও আজীবক উপকের মধ্যে ঘটা ঐ সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতের পেছনে বুদ্ধের মহাকরুণা প্রেরিত দিব্যদৃষ্টিই ছিল

মুখ্য কারণ। শাস্তার ঐ দিব্যদৃষ্টি মুখ্যত আজীবক উপকের ভাবী জীবনকে তৎক্ষণাৎ প্রভাবিত না করলেও, তাঁর পরবর্তী জীবনে দীর্ঘকালীন প্রভাব ফেলে এবং সুগতিদানে পরম সহায়ক হয়।

আলো লুকিয়ে রাখার বস্তু নয়। লুকিয়ে রাখা আলোর কোন না কোন রূপে একদিন বহির্প্রকাশ হবেই। তা না হলে যে আলো নিজেই নিভে যাবে। নিভে যাবার চেয়ে আলোর প্রজ্জ্বলিত থাকা ও এর বহির্প্রকাশ বা নিরন্তর বিস্তার হওয়াই ভাল। জ্ঞানও আলোর মতো। জ্ঞানে আনন্দের সৃষ্টি হয়। জ্ঞানদানে জ্ঞান বাড়ে। সাথে আনন্দও বাড়ে। জ্ঞানের সীমা নেই। জ্ঞানদান-জনিত আনন্দেরও সীমা নেই। তাই বুদ্ধ বলেছেন-- **সব্বদানং ধম্মদানং জিনাতি**। **'ধম্মদান'** অর্থাৎ জ্ঞানদান। সংসারে যত প্রকারের দান রয়েছে তার মধ্যে ধর্ম (জ্ঞান)-দানই সর্বশ্রেষ্ঠ। এ জ্ঞানদানজনিত পুণ্যার্জনের তাগিদে বুদ্ধগয়ায় থাকাকালে "বুদ্ধের দিব্যদৃষ্টি ও আজীবক উপক " শীর্ষক গ্রন্থের রচনায় রত হই। এভাবে এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির প্রারম্ভিক মূলকাঠামো সেখানেই তৈরী হয়ে গিয়েছিল।

এরপর জ্ঞান অন্বেষার জিগিসায় দিল্লী আসা হয়। ১৯৭৯ ইং সনের মাঝামাঝিতে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধ অধ্যয়ন বিভাগে গবেষকরূপে যুক্ত হই। সাথে বুদ্ধ ত্রিরত্ন মিশনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বভার এসে পড়ে। এর পর ১৯৮১ ইং সনের মাঝামাঝিতে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধ অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপকরূপে চয়িত হই। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও সামাজিক কাজে- কর্মে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ি যে অন্য অনেক কিছুর সাথে স্বরচিত এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির কথাও ভুলে যাই। এরপর মায়ের নির্দেশক্রমে আমাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ভাই সরিৎ বড়ুয়ার দিল্লী আগমন হয়। মাঝে মধ্যে অন্য ভাই-বোনেরাও আসে। তাদের যৌথ প্রয়াসে আমার এলোমেলো

জিনিষগুলো গুছিয়ে রাখা হয়। একবার এই গোছানোর কাজের সময় এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ভাই সরিতের হাতে পড়ে। এর সাথে আরও প্রায় ২০ টি স্বরচিত স্বতন্ত্র বাংলা প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও বইয়ের, আর প্রায় ৬টি ইংরেজী এবং বাংলা ও দেবনাগরী অক্ষরে লিপ্যান্তরিত ও সম্পাদিত প্রায় ৭টি পালি পাণ্ডুলিপি তার নজরে পড়ে। এসব হারানো সম্পত্তি খুঁজে বের করার জন্যে মনে মনে অশেষ আশীর্বাদ জানাই তাকে। পাণ্ডুলিপিগুলো হাতে পেয়ে ওসবে এক নজর দিই। দেখতে পাই- ওগুলো পাণ্ডুবর্ণের হয়ে জর্জর হয়ে পড়েছে। বুঝতে পারলাম এ কারণেই এদেরকে পাণ্ডুলিপি বলা হয়। আরও দেখলাম মাঝের কিছু পাতা হারিয়ে গেছে। কিছু পাতা ক্ষয়গ্রস্ত হয়েছে। ওটির আর কোন প্রতিলিপি ছিল না। ঐ অবস্থায় ঐ হারিয়ে যাওয়া পাতাগুলোর বিষয়বস্তুর ঘটনাক্রম একে একে মনে করা আর আবার নতুন ভাবে লিপিবদ্ধ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম।

২০০৩ ইং সনের গরমের ছুটি থাইল্যাণ্ডে কাটানোর সিদ্ধান্ত নিই। যাবার সময়ে এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি নিয়ে যাই সেখানে। থাইল্যাণ্ডনিবাসী আমার এক প্রাক্তন ছাত্র থাইল্যাণ্ডের এক বিহারে আমার আহার-বিহারের ব্যবস্থা করে দেন। বিহারটির নাম- 'ওয়াট সংবেগ'। বিহারে পা রাখতেই সেখানকার পরিবেশ আমায় মুগ্ধ করে। সংকল্প গ্রহণ করি এ গ্রন্থের অর্দ্ধ-সমাপ্ত কাজ এখানে থাকাকালে পুরো করতেই হবে। সাধু সংকল্পের আশ্চর্য পরিণাম ঘটে। এর গ্রন্থ রচনার কাজ ব্যস্ত হই। প্রায় সপ্তাহ খানেকের পরিশ্রমে কাজ সম্পন্ন হয়। আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে দিল্লী ফিরে আসি।

এ গ্রন্থের মুখ্য পাত্র শাস্তা বুদ্ধ, আজীবক উপক, ও তাঁর পত্নী চাঁপা আদির কেহ কাল্পনিক পাত্র নন। ঘটনাক্রমের বর্ণনায় হয়ত কোথাও

প্রতিপাদ্য বিষয়কে আলাপচ্ছলে বাড়ানো হয়েছে। সংবাদশৈলী সম্পূর্ণত এই গ্রন্থকারের। আশ্বাস-প্রশ্বাস ও আনাপান এ দুয়ের বর্ণনা ও পারস্পরিক, সম্বন্ধ মজ্ঝিমনিকায়, অট্ঠকথা, বিসুদ্ধিমগ্গ অট্ঠকথা, নেত্তিপ্পকরণ অট্ঠকথাদি গ্রন্থের সমূহের ভিত্তিতে করেছেন। গ্রন্থের বিষয়বস্তু পূর্ণত শাস্ত্র ভিত্তিক। দিল্লী ফিরে এসে সাহিত্যিক অঙ্গ-সম্ভারে গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করার, গ্রন্থে উল্লিখিত ঘটনার বিস্তার ও পুষ্টির উদ্দেশ্যে একাধিক স্থলে পালি অর্থকথার সাহায্য নিয়েছি। দিল্লীর বাজারে বাংলা অক্ষরে টাইপ করা এক দুষ্কর ব্যাপার। এর পর ভাই সরিৎকে দিই বাংলা অক্ষরে কম্প্যুটর কম্পোজিশন করতে। এর সাথে সে শেষ সব কটি গ্রন্থের ও নিবন্ধ-প্রবন্ধাদিরও বাংলায় কম্প্যুটর কম্পোজিশন স্বেচ্ছায় করে ফেলে। সংশোধনের প্রক্রিয়ায় তাকে এক গ্রন্থের কমপক্ষে সাত-আটবার কম্পোজ করতে হয়। তারই স্বতস্ফূর্ত পরিশ্রমের পরিণাম স্বরূপ এ গ্রন্থটি এত নির্ভুলভাবে কম্পোজ করা সম্ভব হয়েছে। এতসব হওয়া সত্ত্বেও এটি প্রকাশকের অভাবে গ্রন্থাকারে পাঠকের হাতে পরিবেশিত হতে পারেনি এতদিন। প্রকাশকের তল্লাসিতে একে বহুদিন বাক্সবন্দী হয়ে থাকতে হয়। নিজস্ব বাড়ী বা বিহার না থাকায় এসবের যথোচিত স্থানান্তরের সমস্যা এসে দাঁড়ায়। ১লা জানুয়ারী, ২০০৭ তারিখে আবার স্থানান্তরণ হয়। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত নতুন বাসভবনে আসি। এবারও ভাই সরিৎ নিজেই আমার রচিত গ্রন্থগুলোর মূল পাণ্ডুলিপির সুরক্ষার ভার নিয়েছিল। এতে সম্পূর্ণত দুশ্চিন্তা মুক্ত ছিলাম।

সংশোধনক্রমে এ গ্রন্থ কয়েকবার পড়েছি। যতবারই পড়েছি মনে হয়েছিল এই বোধ হয় শেষ সংশোধন হল। কিন্তু প্রতিবারই কিছু না কিছু ভুল-ভ্রান্তি বেড়িয়েছে। শেষ সংশোধনের অবসর পাই অষ্ট্রেলিয়ায়। BLIA অয়োজিত এক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেবার

অজুহাতে অষ্ট্রেলিয়ায় প্রায় তের দিন (৩ রা হতে ১৫ই অক্টোবর, ২০০৭) প্রবাস কাটানোর সুযোগ আসে। তেইশ জন BLIA সদস্য-সদস্যাদের নিয়ে প্রথমে Sydney স্থিত Combodian Buddhist Temple- এ অবস্থান করি। এরপর Wollangon- এ স্থিত Nantien Temple- এ ৬ই অক্টোবর আসি। ৭ই হতে ৯ই অক্টোবর অধিবেশন চলে। বিশেষ অনুরোধে Nantien Temple এর ব্যবস্থাপক Rev. Shizan Zhang মহোদয় ১৫ই অক্টোবর অবধি থাকার ব্যবস্থা করে দেন। Temple এ আহার-বিহারের সুব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুকূল এবং প্রাত্যহিক কর্ম ব্যস্ততার দুশ্চিন্তা না থাকায় এ গ্রন্থের বিষয়বস্তুতে পুনর্বলোকনের সুযোগ পাই। এ গ্রন্থের এ শেষ সংশোধন করার সুযোগ দানের জন্যে Nantien Temple কর্তৃপক্ষকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

পরম আশ্চর্যের বিষয় এই আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্রে অবস্থানকালে (১৯৭৫-১৯৭৯) এ গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু হয়েছিল, প্রায় ২৯ বছর পর বিদর্শনার্চায পরমারাধ্য ডঃ রাষ্ট্রপাল মহাস্থবির ভন্তের শুভার্শীবাদে, ঐ কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক আয়ুষ্মান ডঃ বরসম্বোধি মহাস্থবিরের বিশেষ প্রয়াসে এবং ধর্মপ্রাণ উপাসক শ্রী প্রদীপ বড়ুয়া এবং তদীয় সহধর্মিনী শ্রীমতী মাধবী বড়ুয়া উপাসিকার আর্থিক সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হল।

গ্রন্থ গ্রন্থকারের সন্তানতুল্য হয়। গ্রন্থ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে দেখে অফুরন্ত প্রীতি-প্রমোদ অনুভব করছি। এই অবসরে বোন দীপু ও শর্মিলাকে গ্রন্থের শব্দালংকরণের কাজ নিপুণতার সাথে পালন করার জন্যে অশেষ আশীর্বাদ জানাই। বিশেষ চয়িত শব্দে গ্রন্থ-পরিচিতি লেখায় মাননীয় অধ্যাপক সুনীতি কুমার পাঠক মহোদয় আমার চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হয়েছেন।

এছাড়াও প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে আর যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে বা প্রেরণা দিয়ে এর প্রকাশনাকার্যকে তরান্বিত করেছেন তাদের সকলেও আমার কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হয়েছেন। তাঁদের মাধ্যমে শাসনের প্রচার-প্রসার উত্তরোত্তর আরও অধিকতর হউক কামনা করি। ত্রিরত্নগুণপ্রভাবে তাদের সবার সর্ব বিধ মঙ্গল হউক।

তারিখ : ১৯ই মে, ২০০৮ ভিক্ষু সত্যপাল
তিথি : বুদ্ধ পূর্ণিমা (২৫৫২ বুদ্ধাব্দ) গ্রন্থকার

অর্থদাতাদের পরিচয়

কোলকাতাস্থ সোদপুর নিবাসী শ্রী প্রদীপ বড়ুয়া, এবং তদীয় সহধর্মিণী শ্রীমতী মাধবী বড়ুয়া সদ্ধর্মে নিবেদিত- প্রাণ উপাসক-উপাসিকা, সদ্ধর্মের প্রচার-প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধিকল্পে তাঁদের ত্যাগশীলতা প্রশংসার দাবী রাখে। তাঁদের আর্থিক বদান্যতায় অনেক ধর্ম ও সেবা প্রতিষ্ঠানের পুষ্টি সাধিত হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে ধর্মীয় গ্রন্থ। এ পর্যন্ত, যে সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে তাঁদের দানের উজ্জ্বল নিদর্শন রয়েছে সেগুলি হল আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্র ও আনন্দ বিহার, বুদ্ধগয়া; ধর্মাধার বৌদ্ধ বিহার, নাটাগড়, সোদপুর; মোহনপুর কুঞ্জবন বিহার; জ্ঞানালংকার বুড্ঢিষ্ট সংঘে এক কাঠা জমি, দিগবেড়িয়া; রেঙ্গুন ধর্মদূত বিহার, বার্মা; সুহৃদা অনাথ ও দুঃস্থ সেবা কেন্দ্র, শ্রীলংকা; শান্তিনিকেতন আম্বেদকর বুড্ঢিষ্ট ওয়েলফেয়ার মিশন, বোলপুর; ইছাপুর তথাগত বিহার; সূর্যপুর ত্রিরত্ন বুড্ঢিষ্ট ফাউণ্ডেশন; সাঁতরাগাছি বুড্ঢিষ্ট ওয়েলফেয়ার এসোশিয়েশন; বাংলাদেশ বুদ্ধ বিহার, বুদ্ধগয়া; সিদ্ধার্থ ইউনাইটেড সোস্যাল ওয়েলফেয়ার মিশন; শীলকুপ কেন্দ্রীয় চৈত্য বিহার, বাঁশখালী, বাংলাদেশ; পূর্ব আঁধারমানিক শ্রদ্ধানন্দ বিহার, বাংলাদেশ; এবং ওয়াট মগধ বিপস্সনা সেন্টার, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ইহা ছাড়াও আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্র, বুদ্ধগয়ার সাধারণ সম্পাদক ড. বরসম্বোধি ভিক্ষু বিরচিত "মৃত্যুর পরে" বইটি প্রকাশনার ব্যয়ভার বহন করে সদ্ধর্ম প্রচারে তাঁরা বলিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন। সমাজ ও ধর্মের গঠন মূলক যে কোন সভা সমিতি ও অনুষ্ঠানাদিতে তাঁদের উদার হস্ত বহুজনের প্রেরণার সঞ্চার করে।

তাঁরা উভয়ে বুদ্ধগয়া আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্র, মহাবোধি সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া, বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র, কোলকাতা, প্রভৃতির আজীবন সদস্য-সদস্যা। ধর্মাধার সেবা কমিটি ও বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের কোষাধ্যক্ষ পদে বৃত থেকে প্রদীপবাবু দীর্ঘদিন যাবৎ সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে তিনি আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্র-বুদ্ধগয়ার আমন্ত্রিত সদস্য।

সংসার জীবনে এ দম্পতির রয়েছে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। তাঁরা উভয়ে উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করে সরকারী চাকরি নিয়ে স্বীয় স্বীয় কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত।

প্রদীপবাবুর পৈতৃক নিবাস চট্টগ্রামের রাউজান থানাধীন কদলপুর গ্রাম। বর্তমানে সোদপুর কল্যাণ নগর, বড়ুয়া পাড়ায় স্থায়ী আবাস গড়ে তুলেছেন। ধর্মগ্রন্থ প্রকাশ জনিত পুণ্যরাশির প্রভাবে এ দম্পতি ও তাঁদের পরিবারস্থ প্রত্যেকের উত্তরোত্তর মঙ্গল কামনা করছি।

শুভার্থী

তারিখ : ১৯/০৫/২০০৮ ভিক্ষু সত্যপাল
তিথি : বুদ্ধ পূর্ণিমা গ্রন্থকার

বুদ্ধের দিব্যদৃষ্টি ও আজীবক উপক

বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর গৌতম বুদ্ধ উরুবেলায় বোধিবৃক্ষমূলে বজ্রাসনে ও এর পার্শ্ববর্তী আরও ছয়টি স্থানে সাত সপ্তাহ কাটান। এর পর পুন অজপাল নিগ্রোধমূলে ফিরে আসেন। এখানে অবস্থানকালে শাস্তা চিন্তায় মগ্ন হন- 'এ সংসারে কে এমন আছে যে আমার কষ্টার্জিত ও অশ্রুতপূর্ব জ্ঞানের কথা সহজে বুঝতে পারবে?' অধিকতর প্রাণীকে কামনা-বাসনায় অধিক লিপ্ত দেখে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হন। ঠিক ঐ সময় শাস্তার মনোদশা জানতে পেরে সহম্পতি ব্রহ্মা তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হন। অভিবাদনান্তে সহম্পতি ব্রহ্মা শাস্তাকে অনুরোধের সুরে জানান- 'শাস্তা ভগবান, সংখ্যায় কম হলেও, আপনার ধর্মোপদেশ শুনে অনুত্তর ধর্মের জ্ঞাতা হবার যোগ্যতা রাখেন এমন প্রাণী সংসারে আজও রয়েছে। ধর্মপ্রচারে দ্বিধাগ্রস্ত হবেন না। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ধর্মপ্রচারে ব্রতী না হলে দুঃখী প্রাণীর ও সম্পূর্ণ সংসারের অফুরন্ত ক্ষতি হবে।' সহম্পতি ব্রহ্মার অনুরোধ রক্ষার্থে শাস্তা তাঁর নীরব স্বীকৃতি দেন। নীরব স্বীকৃতি পেয়ে সহম্পতি ব্রহ্মা তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হন। এবার শাস্তা সহম্পতি ব্রহ্মাকে দেওয়া কথানুসারে ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন। তবে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে- কাকে তাঁর ধর্মোপদেশ প্রথম শোনাবেন? কোথায় শোনাবেন?

তিনি চিন্তা করলেন- দুষ্কর তপশ্চর্যাকালে যে পঞ্চবর্গীয় শিষ্য সেবা-শুশ্রুষার মাধ্যমে আমার প্রভূত উপকার করেছিলেন, তাঁরা অন্যদের চেয়ে অধিকতর জ্ঞানী। তাঁদেরকে আমার কষ্টার্জিত অশ্রুত-পূর্ব ধর্মজ্ঞানের কথা শোনালে, বোঝালে তাঁরা বুঝবেন। তাঁদের মধ্যে সে ক্ষমতা রয়েছে। তবে তাঁরা তো উরুবেলা ত্যাগ করেছেন বহু দিন

হয়। এখন তাঁরা আছেন কোথায়? তা জানার জন্যে দিব্যদৃষ্টি প্রসার করেন। জানতে পারেন তাঁরা বর্তমানে কাশীর রাজধানী বারাণসীর অদূরে ঋষিপত্তনে আছেন। তা জেনে সেখানে যাবার সিদ্ধান্ত নেন।

উরুবেলা হতে বারাণসীর পথ ১৮ যোজন। এ দূর যাত্রাপথ চাইলে তিনিও তাঁর পূর্ববর্তী বুদ্ধগণের মতো ইচ্ছামাত্রে তড়িৎগতিতে অতিক্রম করতে পারতেন। স্থল বা আকাশে কোন্ মার্গে গেলে বহুজনের কল্যাণ সাধিত হবে তা জানার জন্যে আবার যাত্রাপথে দিব্যদৃষ্টি প্রসার করেন। জানতে পারলেন আকাশমার্গে গমন করলে ঐ পঞ্চবর্গীয় শিষ্য ছাড়া আর কারও উপকার তিনি করতে পারবেন না। পায়ে হেঁটে কিছুদূর গেলে অন্তত আর এক-জনের উপকার তো অবশ্যই হবে। তা জেনে স্থল-পথে প্রথমে গয়া যাবার সিদ্ধান্ত নেন। বোধিবৃক্ষ হতে নৈরঞ্জনা নদীর ধার দিয়ে উরুবেলা গ্রামের বড় রাস্তা হয়ে শাস্তা গয়া অভিমুখে রওনা দেন। উরুবেলা হতে তিন গাবুত দুরে অবস্থিত গয়া যাবার মধ্যবর্তী পথে পৌঁছেছেন এমন পরিস্থিতিতে শাস্তা উপককে গয়া হতে আসতে দেখেন। মুখোমুখী হতেই উপক থেমে যায়। তাঁকে থামতে দেখে শাস্তাও থেমে যান।

এই তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ। সৌজন্যমূলক প্রারম্ভিক পরিচয় বিনিময় হয়।

উপক - আপনার প্রসন্ন মুখমণ্ডল ও দিব্য দেহ-কান্তি দেখে বেশ ভাল লাগছে। মহাত্মন আপনি কে?

বুদ্ধ - আমি সর্ববিদ। আপনি কে?

উপক - আমি উপক। আপনার সন্ন্যাস-গ্রহণের উদ্দেশ্য কি? বলবেন কি দয়া করে?

বুদ্ধ - তৃষ্ণা-ক্ষয়। আপনার সাধু-জীবনের উদ্দেশ্য কি?

উপক - পাপ-পরিহার।

বুদ্ধ - পাপ-পরিহার কি হয়েছে আপনার?

উপক - আমি নবাগত। পাপ-পরিহার-মূলক পথের পথিক হয়েছি মাত্র?

বুদ্ধ - আপনি কোন পরম্পরাকে অনুশরণ করেন?

উপক - আমি আজীবক পন্থী। আপনি কার শিষ্য? কেই বা আপনার শিক্ষক?

বুদ্ধ - আমি স্বয়ম্ভূ সর্বজ্ঞ বুদ্ধ। ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য বশীভূত করেছেন এমন সম্যক্-সম্বুদ্ধ বর্তমানকালে আমি একা। অপ্রতিদ্বন্দী। এ সংসারে দেব-মানব-ব্রহ্মার কেহই আমার সমতুল্য নয়। আমার আচার্য-প্রাচার্য নেই। আমার পূজ্য কেহ নয়। সবার আমি পূজ্য। আমিই অর্হৎ।

উপক - কোথায় চলেছেন আপনি?

বুদ্ধ - অন্ধকারে আলো দিতে। মোহান্ধকার-পূর্ণ সংসারে অমৃতময় ধর্মদুন্দুভি বাজাতে কাশীনগরে ধর্মচক্র-প্রবর্তন করব। আপনি কোথায় চলেছেন?

উপক - দেশভ্রমণে বেরিয়েছি। বন্ধুবর, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি অনন্তজিন হবার উপদেশ দেন।

বুদ্ধ - হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই। পাপ-পরিহার করে আমি জিন হয়েছি। ক্ষীণাস্রবগণের প্রত্যেকেই আমার মত জিন।

উপক - বেশ, বেশ। হলেও হতে পারেন।

(মাথা নেড়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।)

চলার পথে প্রশ্নোত্তরকালে উভয়ে একে অপরকে ভালভাবে দেখে নেন। কিছু দূর গিয়ে বিদায় নিয়ে উপক অন্য পথে পা বাড়ায়।

আজ এদেশে, কাল ওদেশে ভ্রমণ করে উপক মগধের দক্ষিণে বঙ্কহার গ্রামে এসে পৌঁছান। পথে ঐ গ্রামেরই এক ব্যাধের সঙ্গে দেখা হয়। পথে তার সঙ্গে পরিচয় হয়। পথ চলার ক্লান্তিও কিছুটা কমে। উপকের ব্যবহারে ব্যাধ তুষ্ট। উপককে ক্লান্ত দেখে তার বাড়ীতে থাকার অনুরোধ করলেন। অনুরোধ রক্ষার্থে উপক ব্যাধের বাড়ীতে রাত্রি যাপন করেন। পরদিন সকালে ব্যাধ শিকারে বের হবার পূর্বে তার মেয়েকে ডাকিয়ে আনলেন। আজীবক উপকের সেবা-শুশ্রুষার দায়িত্ব মেয়ের উপর দিয়ে শিকারী চলে যায়।

শিকারীর অবর্তমানে ব্যাধের কুমারী কন্যা সেবা-সৎকারে তৎপর হয়। কন্যা সুরূপা। বয়সে সে ষোড়শী হবে। বর্ণে একেবারে সদ্য ফোঁটা কাঞ্চনবর্ণা চাঁপা ফুল। দর্শনে নয়ন-আকর্ষক ও মন-মোহক্। বারম্বার নাম জিজ্ঞেস করায় কন্যা লজ্জা পায়। আলাপে নাম জানা গেল। নাম তার চাঁপা। নামে আর রূপে এ অপূর্ব মিল, উপকের তা বিশ্বাস হয় না। আহারান্তে ও দিবাবিহারের পর নানাকাজের অজুহাতে শিকারী-কন্যা এসে আজীবক উপককে দেখে যায়।

শিকারে মারা বন্য জন্তুর মাংস বিক্রী করে প্রতি দিনের আহার্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে শিকারী দিনান্তে বাড়ী ফেরে। ক্লান্তি বিনোদনের পর শিকারী উপকের সাথে আলাপ করতে আসে। সময়াসময়ে যা প্রয়োজন তা চাঁপার কাছে চাইবার বা তার সাহায্য নেবার পরামর্শ দিয়ে শিকারী শুয়ে পড়ে। পরদিন সূর্যোদয়ের পূর্বেই তীর-ধনুকাদি অস্ত্র নিয়ে শিকারী আবার শিকারে বেরিয়ে পড়ে বনে

অরণ্যে। দিনান্তে ফিরে এসে খানিকক্ষণ আলাপের পর নিত্য নৈমিত্তিক কর্মে সে লিপ্ত হয়।

কয়েকদিনের আলাপে আর সেবা-শুশ্রুষায়, কচি কাঁচা কাঞ্চন-বর্ণ চাঁপার প্রতি উপকের মনে মমত্ব-ভাব জাগে। সে অত্যধিক প্রভাবিত ও মুগ্ধ হয়। উপকের মাংসল সটান দীর্ঘ দেহ-সৌষ্ঠবে চাঁপাও মুগ্ধ। উভয়ের মধ্যে পরস্পরকে কাছে পাবার এক তীব্র বাসনা জাগে। চার চোখের মিলনে অব্যক্ত ভাষায় তারা পরস্পরকে বুঝতে পারে। মনের মিলন ঘটে। কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের দৈহিক দুরত্বের ব্যবধান কমতে থাকে। ক্রমশ তা শূন্য হয়। একদিন তারা নিজেদেরকে পরস্পরের প্রেমপাশে আবদ্ধ দেখে। একে একে একাকার হয়ে পড়ে। অনাস্বাদিত যৌবন-মদে মত্ত হয়েও চাঁপা চাপা থাকে। ধৈর্যহারা হয় নি। উপক কিন্তু ধৈর্যহারা। বাঁধভাঙ্গা বন্যার জলের ন্যায় কামলিপ্সা যেন তার মধ্যে উপচে পড়েছে।

চাঁপার শিকারী-পিতা শিকারে ব্যস্ত। অন্য ভাবনার তাঁর সময় কৈ? বিয়ে করার প্রস্তাবে চাঁপা ও উপক উভয়ে সম্মত। তবে পিতার অমতে চাঁপা কিছু করতে রাজী নয়। মুখ ফুটে সোজাসুজি পিতাকে সে নিজে কিছু বলতেও চায় না। উপকও চাঁপার পিতাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। শেষে চাঁপার শিকারী পিতার সম্মতি লাভের এক অভিনব উপায় উপক বের করে। শিকারীকে কিছু না বলে না কয়েই একদিন সে উপবাসের মিছে ভান করেন। উপককে উপবাসে ব্রতী দেখে চাঁপার পিতা চাঁপাকে সতর্ক করে যায় যেন তার ব্রতে বিঘ্ন না ঘটে। ক্রমাগত কয়েকদিন উপবাসে থাকায় উপক পূর্বাপেক্ষা দুর্বল হতে থাকে। শিকারী এবার একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। শিকারী জানতে চায় এ আবার কেমন ব্রত? এ ব্রতের নাম কি? এ ব্রত-পালনের ফলাফল কি? ইত্যাদি। উপক কিছুই বলেন নি। এভাবে ক্রমাগত

সাতদিনের উপবাসে উপকের প্রাণ কণ্ঠাগতপ্রায়। কোন অনিশ্চিত অঘটন ঘটার দুশ্চিন্তায় শিকারী প্রমাদ গুণল। উপককে উপবাস-ব্রত ভাঙ্গার অনুরোধ ও সাধাসাধি করল সে। শিকারীর সহানুভুতিশীল মনোদশা বুঝতে পেরে উপক শিকারীর নিকট একটি সশর্ত সাধ জানায়। শর্তটি হল- চাঁপাকে সে বিয়ে করবে, বিয়ে দিতে সম্মত থাকলে সে উপবাস-ব্রত ভাঙ্গবে। নচেৎ নয়। চাঁপার বিরহে উপক প্রাণত্যাগ করতেও কটিবদ্ধ দেখে শিকারী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শর্ত মেনে নেয়। এর পর এক শুভ লগ্নে চাঁপা ও উপক বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সন্ন্যাসী উপক সংসারী উপক সাজেন।

সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে গা ভাসিয়ে চলার ন্যায় তারা দুজনে যৌবন রস-সাগরে নিজেদেরকে ভাসিয়ে দেয়। এভাবে কয়েকমাস কেটে যাবার পর চাঁপার পিতা উপককে জীবিকা-অর্জনের পরামর্শ দেয়। ঠিক হয় চাঁপার শিকারী- পিতা যা শিকার করে আনবেন তা উপক গ্রামে বাজারে ফেরী করে সংসার চালাবেন। এভাবে দিনকাটায় উপক শ্বশুর-বাড়ীতেই থেকে যান।

অনভ্যস্ত কর্ম ও গার্হস্থ্য ধর্মের চাপে উপক হিমসিম খেয়ে যান। স্বতন্ত্র পেশা না থাকায় সীমিত আয়ে তাদেরকে দিনাতিপাত করতে হয়। ভাল শিকার হলে আয় মোটামুটি হয়। না হলে উপোস। উপক নিজে শিকার জানেন না। কাজেই ভাল-মন্দ সব শ্বশুরের শিকারের উপর নির্ভর করে। উপকের নিজস্ব চাহিদা বলতে তেমন কিছুই নেই। চাঁপার চাহিদাই বেশী। এটা চাই, ওটা চাই। চাই চাই ছাড়া, কথা নাই। সময়ে চাহিদা না মিটলেই হয়, চাঁপা আর চাপা থাকে না। গোলাপের কাঁটা হয়ে চাঁপা উপকের (কর্ণ-কুহর দিয়ে) হৃদয়ে বিঁধে। কথা কাটাকাটি হয়। মনোমালিন্য বেড়ে গেলে মনের বেদনা মনেই চাপা রাখে উপক। শ্রীগুণে সুশ্রী হলেও শিক্ষার অভাবে চাঁপা অনেকটা

গেঁয়ো স্বভাবের। ব্যবহারেও অপটু। সময়াসময়ের জ্ঞানগম্যি নেই। লাগামহীন ঘোড়ার ন্যায় যখন যা ইচ্ছে সে বলে ফেলে।

দৈহিক গঠনে সুষ্ঠ-বলিষ্ঠ হলেও শ্রী-সম্পত্তি উপকের ছিল না। বর্ণে সে ভ্রমর-কৃষ্ণ। নাক্-নক্সাতেও তেমন আকর্ষক নয়। তার তুলনায় চাঁপা ছিল এক অনিন্দ্য সুন্দরী রূপসী। রূপের অহঙ্কার কার না থাকে। চাঁপারও ছিল। তবে চাপা। বৈবাহিক জীবনের প্রথমদিকে অনাস্বাদিত যৌবন রস-উন্মাদনায় স্বামীর ওসব দোষ দূষণীয় বলে মনে হয় নি। কিন্তু কেন যেন চাপা অহঙ্কার চাঁপা আর চাপা রাখতে পারে নি। স্বামীর কৃষ্ণবর্ণ তার নিকট বিরাট দূষণীয় বলে মনে হতে থাকে। স্পষ্ট-ভাবে না বললেও আকারে প্রকারে সে স্বামীর বর্ণদোষের প্রতি সংকেত করতো। কখনো কাল বলে স্বামীকে সম্বোধন করতো। কখনও ডাকতো কালা। আবার কখনও কালো। উপক কিন্তু প্রথম দিকে চাঁপার এ আচরণে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করে নি। মনে করতো পত্নী তাকে সোহাগ ভরে ডাকছে। পরে পরে সে বুঝতে পারে চাঁপা তাকে সোহাগ ভরে নয়, বরংচ বিদ্রূপ করেই কালো কাল আর কালা; ডাকে। বুঝতে পারলেও নিজের বর্ণ-দোষের দুর্বলতা দেখে সে সব বিষ নীরবে হজম করে যায়।

চাঁপা গর্ভবতী হয়। সময় পেরিয়ে যাবার সাথে আসন্ন-প্রসবা চাঁপার উদর-পটল বৃদ্ধি পায়। বর্ণ বিবর্ণ হয়। আকার তার প্রেত্নী সদৃশ্য বিকৃত হয়। উপক সুযোগ পেয়ে অন্য যুবতী মেয়েদের দিকে সংকেত করে চাঁপাকে বলে- দেখ ওরা কত সুন্দর। উপকের কটাক্ষ উক্তির উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে চাঁপাও নীরবে স্বামীর কটাক্ষোক্তি সয়ে যেত। একে গর্ভভার, তার উপর স্বামীর এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহার। দুয়ের ভারে ভারাক্রান্তা চাঁপাও সব চেপে যায় কালের প্রতীক্ষায়।

যথাসময়ে তাঁরা পুত্র-সন্তান লাভ করে। তাদের আনন্দের আর সীমা থাকে না। সন্তান দেখতে চাঁপার মতই কাঞ্চনবর্ণের। উভয়ে শিশুর নাম রাখে সুভদ্র। কিন্তু এই আনন্দের মধ্যেও নিরানন্দ সৃষ্টি করে চাঁপার চাপা অহঙ্কার। সন্তান-প্রসবের পর চাঁপা তার স্বাভাবিক শ্রী ফিরে পায়। রূপ-শ্রী ফিরে আসার সাথে স্বামীর পরোক্ষ কটাক্ষ উক্তির কথা মনে পড়ে যায় তার। একে রূপের অহঙ্কার, তার উপর পুত্র-সন্তান লাভের অহঙ্কার। দুয়ে মিলে চাঁপা দুর্ভাবনাগ্রস্ত হয়। চাঁপা গায়ের ঝাল মেটাবার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে থাকে। হাবভাবে সে স্বামীকে তুচ্ছ-জ্ঞানে চটাতো। সারাদিন এগ্রামে ওগ্রামে ফেরী করে দিনান্তে বাড়ী ফিরে এসে উপক চাঁপার কাছ হতে পূর্বেকার মতো সেবা-সৎকার আর সম্ভাষণ পায় না। কোলের শিশু সুভদ্র কেঁদে উঠলে স্বামীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতো-

'আহা, উপক-পুত্র কাঁদে। আহা, সাধু-সন্তান কাঁদে। আর কেঁদো না। আর কেঁদো না।'- ইত্যাদি বিদ্রূপ বাক্য বলে বলে ছেলেকে ঘুম পাড়াতো। অবোধ সুভদ্র ঘুমিয়ে পড়তো। উপকের ঘুম ভাঙ্গতো। এই নিয়ে তাদের তুমুল তর্ক হতো।

উপক শান্তভাবে চাঁপাকে বুঝিয়ে বলে- সে যেন এ ধরণের বিরক্তিকর তুচ্ছতাচ্ছিল্য ব্যবহার আর না করে। উপক একথাও বোঝানোর চেষ্টা করে- আত্মীয়-স্বজন না থাকলেও তার এক পরমমিত্র আছে। মিত্রের নাম অনন্ত-জিন। চাঁপার স্বভাব বদলে গেলে সে থাকবে, আর তা না হলে সে তার অনন্তজিনের কাছে চলে যাবে- একথাও উপক চাঁপাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়।

উপকের কথায় চাঁপা ভেবে নেয় কালার অনন্তজিন নিশ্চয়ই কোন মেয়ে-মানুষ নয়। অনন্তজিনও তার কালার মতো আরেক কালো

পুরুষ হবে। খুব বড় জোর গ্রামের না হয়ে শহরের হবে। এই তো। বন্ধুর বাড়ীতে বন্ধু যাবে, এতে চিন্তা কিসের? উপকও যাবে, যাক্। কয়েকদিন পর ফিরে না এসে, যাবে কোথায়? এ ধারণায় উপকের কথায় চাঁপা মোটেই গুরুত্ব দেয় নি। স্বভাব পরিবর্তনের প্রশ্নই উঠে না।

অনন্তজিনের কাছে চলে যাবার মৃদু হুমকি দেওয়া সত্ত্বেও চাঁপার কোন পরিবর্তন লক্ষ্য না করায় উপক অন্য উপায় অবলম্বন করে। চাঁপার পৈতৃক বাসস্থান এবং গ্রাম ত্যাগ করলে তার চাঁপার মধ্যে পরিবর্তন হবে আশায় স্ত্রী-পুত্র নিয়ে নিজ গ্রাম 'নালা'য় চলে যায়। পিতার স্নেহ, পৈতৃক বসত-ভিটে ও স্বগ্রাম ত্যাগের কোন প্রভাব চাঁপার মধ্যে পড়ে নি। সে তথৈব চ। এভাবে কটু মধু তিক্ততায় মিশ্রিত চাঁপা ও উপকের বৈবাহিক জীবনের কয়েকটি বছর দেখতে না দেখতেই কেটে যায়। এর মধ্যে সুভদ্র বড়ো সড়ো হয়েছে। সাংসারিক কাজে কর্মে সে তার মাকে সাহায্য করে। সুভদ্রের লালন-পালনে চাঁপা বেশী মনোযোগ দেয়।

পরিবর্তনশীল জগতের সর্বত্রই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। চাঁপা ও উপকের মত-পার্থক্যের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তবে তা হ্রাসের পথে নয়, কটুতা বৃদ্ধির পথে। মনের অমিলনে দৈহিক ব্যবধানও তাদের মধ্যে ক্রমশ বেড়ে যায়। অশেষ ধৈর্য ধারণ করা সত্ত্বেও চাঁপার ও তার মতপার্থক্যের তীব্রতায় হ্রাস না দেখে উপক আত্ম-সমালোচনা করে নিজের দোষ জানার চেষ্টা করে। দেহবর্ণ-জনিত দোষ ছাড়া সে তার নিজের মধ্যে আর কোন দোষ খুঁজে পায় না। আর কোন গত্যন্তর না দেখে উপক 'অনন্তজিনের কাছে চলে যাবে' মনে মনে সংকল্প করে ফেলে। এ সংকল্পের কথা চাঁপাকে না বললেও উপকের ব্যবহারে চাঁপার মনে সন্দেহ হয়। যদি স্বামী তার অনন্তজিনের কাছে বেড়াতে

গিয়ে আর ফিরে না আসে, তাহলে চাঁপা কি করবে তা সে নিজেই ভেবে পায় না। চাঁপা উপককে জিজ্ঞেস করে 'অনন্তজিনের কাছে কবে যাবে? কতদিন সে সেখানে থাকবে? তার বন্ধু অনন্তজিনের বাড়ী কোথায়? সংক্ষেপে উপক বলে- 'সময় হলেই যাবে।' উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে চতুর চাঁপা স্বামীর মতিগতি জানার উদ্দেশ্যে হাবভাব কিছুটা বদলে ফেলে। চাঁপার পরিবর্তনকে সাময়িক জ্ঞানে উপক কোন গুরুত্ব দেয় নি। একদিন সুভদ্রকে চুপিসারে মনভরে আদর করে, উপক গৃহত্যাগ করে।

এই কয়েক বছরে উপকের অনন্তজিন জনকল্যাণার্থে জম্বুদ্বীপের, এদেশ হতে ওদেশ, এপ্রান্ত হতে ওপ্রান্ত অবিরাম বেরিয়েছেন। ধর্ম-অভিযান চালিয়ে দিগ্বিজয় করে চলেছেন। তাঁর প্রচারের সুপরিণামে গৃহী-শিষ্যের সাথে সন্ন্যাসী শিষ্যের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যায়। সঙ্ঘ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। শাস্তা বুদ্ধ যেখানেই যান, নক্ষত্ররাজি-মণ্ডিত চন্দ্রের ন্যায় অর্হতধ্বজাধারী ভিক্ষু-ভিক্ষুণী-সংঘ পরিবৃত হয়ে বিচরণ করেন। তাঁর অগণিত গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্যসূমহের নিকট তিনি বুদ্ধ, সম্বুদ্ধ, সুগত, শাস্তা তথাগত, শাক্যমুনি, সম্যক্ সম্বুদ্ধ রূপে অধিক পরিচিত। ভগবান মহাকারুণিক শাস্তারূপেও পূজিত হন। এদের কেহই তাঁকে 'অনন্তজিন' বলে জানেন না।

এই 'অনন্তজিনের' সন্ধানে উপক কত গ্রাম কত রাজ্য তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। কোথাও কেহ তাকে তাঁর সঠিক সন্ধান বলে দিতে পারে নি। তবুও সে নিরাশ নয়। ক্ষান্ত নয়। দৃঢ় বিশ্বাস সে একদিন না একদিন 'অনন্তজিনের' সাক্ষাৎ পাবেই। অনন্তজিনের পথে চলবে। অনন্তজিন হবে। অনন্তজিনের খোঁজে যার কাছে যায় সেই বলে- বুদ্ধকে চিনি। এইত কিছুদিন পূর্বেই সশিষ্য-সংঘ আমাদের গ্রামে এসেছিলেন। কয়েকদিন এ গ্রামে ছিলেন। পূর্বাহ্নকালে সারিবদ্ধভাবে

তাঁরা ঘরে ঘরে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতেন। গ্রামের এই বাগানে বসে গ্রামবাসীকে ধর্মামৃত পান করান। তাঁর অমৃতময় রসক্ষরা ধর্মোপদেশে আমরা গ্রামবাসী আজ ধন্য।

উপক- আমি বুদ্ধের সন্ধান চাচ্ছি না। আমার প্রয়োজন অনন্তজিনের।

গ্রামবাসী- অনন্তজিন বলে তো কাউকে আমরা এ অবধি দেখি নি। এ শব্দ আমাদের নিকট চির অপরিচিত। হলেও হতে পারে কোন এক নবদীক্ষিত সাধারণ সাধু-সন্তের বা পুরুষের নাম।

উপক- না, না। অনন্তজিন সাধারণ পুরুষ নন। তিনি মহান সন্ন্যাসী। তাঁর সঙ্গে আমার কয়েক বছর পূর্বে সাক্ষাৎ হয়েছে। তাঁর শরীরে মহাপুরুষের সব লক্ষণই বিদ্যমান। নৈরঞ্জনা নদীর ধারে উরুবেলা গ্রামের এক অশ্বত্থবৃক্ষের তলে এক বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে তিনি 'অনন্তজিন' হন। সব আস্রব ক্ষয় করে কাশীনগরে ধর্মচক্র-প্রর্বতন করার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন। তিনি অন্যকেও অনন্তজিন হবার উপদেশ দেন।

উপকের মুখে 'উরুবেলা গ্রাম' ও আস্রবক্ষয়' শব্দ দুটি শুনে গ্রামবাসীরা বলেন- আমরা যে মহাপুরুষকে জানি তিনি তথাগত বুদ্ধ তিনিও উরুবেলা গ্রামে দুষ্কর কঠোর তপশ্চর্যা করেছেন। আস্রববিমুক্ত হয়ে মার-বিজয়ী হন। সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রাপ্তির পর তিনিও কাশীনগরের অদুরেই সারনাথে পঞ্চবর্গীয় শিষ্য-সংঘকে তাঁর সাধনা-লব্ধ জ্ঞান দান করে ধর্মচক্রপ্রবর্ত্তন করেন। এই বর্ষার প্রারম্ভে তিনি রাজগৃহ ছেড়ে গেছেন। এবারের বর্ষা কোথায় যাপন করবেন বলা সম্ভব নয়। তিনি মুক্ত পুরুষ। যেখানে অবস্থান করলে বহুজনের কল্যাণ সাধিত হয় সেখানেই তিনি অধিক কাল যাপন করেন।

গ্রামবাসীর মুখে 'তাদের বুদ্ধও উরুবেলা-গ্রামে জ্ঞান লাভ করে কাশী-

নগরে সর্বপ্রথম ধর্মচক্রপ্রবর্তন করেছেন' জেনেও উপকের মনে সন্দেহ জাগে। তবে তার মনে এই ধারণা জন্মেছিল- কোন প্রকারে হয়ত বুদ্ধের মাধ্যমে নিশ্চয়ই অনন্তজিনের সন্ধান পাবেন। এ বলবতী আশায় কাল-ক্ষেপন না করে গ্রামবাসীর কাছ হতে শ্রাবস্তী যাবার পথ-নির্দেশ জেনে নেয়। নতুন উদ্যমে ছুটে চলে। বেশ কয়েকদিনের পথ অতিক্রম করে উপক কোশল দেশের রাজধানী শ্রাবস্তী পৌঁছোন। চলার পথে উপক অনন্তজিনের সন্ধানও করেন। অনন্তজিনের সন্ধান কেহ দিতে পারে নি। অনন্তজিনের পরিবর্তে শ্রাবস্তীর ছেলে বুড়ো সবাই বুদ্ধের কথা বলেন। তাঁর আবাসস্থল সম্পর্কে জানতে চাইলে কেহ পথ বাতলে দেয়। আর কেহ উপককে কিছুদূর এগিয়ে নিয়ে যায়। এভাবে উপক শ্রাবস্তীর এক প্রশান্তিকর প্রাকৃতিক পরিবেশে এসে পৌঁছান। কিছু দুরেই বিহারের প্রবেশদ্বার। বিহারের প্রবেশ-দ্বারের পরই বিহার-প্রাঙ্গনে কয়েকজন মুণ্ডিত মস্তক ও পীতবস্ত্র-ধারী সন্ন্যাসী নীরবে পায়চারী করছেন।

বুদ্ধ তাঁর দিব্যদৃষ্টি প্রসার করে উপকের উপস্থিতি ও তাঁর আগমন-কারণ জানতে পারলেন। তিনি তাঁর আবাসিক ভিক্ষু-শিষ্যকে নির্দেশ দেন- 'অনন্তজিনের' সন্ধানে কেহ আসলে তাকে সোজা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে। নির্দেশ দিয়ে বুদ্ধ নিজ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করেন।

পায়চারীরত ভিক্ষুগণের একজন প্রবেশদ্বারের নিকটে আসলে উপক জিজ্ঞেস করেন- 'আপনি কি অনন্তজিনকে চেনেন? ভিক্ষু উত্তর দেন- 'আমরা অনন্তজিনকে চিনি না। তবে এখানে আমাদের মহাকারুণিক শাস্তা ভগবান বুদ্ধ আছেন। আপনি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করুন। হয়ত তিনি আপনার অনন্তজিনের সন্ধান দিতে পারবেন।' পায়চারীরত ভিক্ষুগণের একজন উপককে সোজা বিহারের কেন্দ্রীয় গর্ভ-প্রকোষ্ঠে নিয়ে যায়। সেখানে উপস্থিত হয়ে উপক যা দেখেন তা তাকে হতবাক্

করে দেয়। যার সন্ধানে এতদিন এত জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি স্বয়ং গর্ভ-প্রকোষ্ঠের এক সুসজ্জিত আসনে আসীন আছেন।

ইষ্ট ব্যক্তির দর্শনজনিত আনন্দোচ্ছাসে উপক উচ্চস্বরে উচ্চারণ করে 'এইত অনন্তজিন, এইত অনন্তজিন'। কে বলে ইনি বুদ্ধ?' আবাসিক ভিক্ষুগণ উপকের কথা শুনে হতবাক। বুদ্ধের পাদমূলে সাষ্টাঙ্গিক প্রণিপাত করে। বহুদিনের সাধ্য-সাধনার পর আজ যে তার অনন্ত-জিনের দেখা হল। তার আনন্দের সীমা নেই। বুদ্ধ মুচকি হাসেন। উপক খানিকক্ষণ কি করবে কি বলবে ভেবে না পেয়ে নির্বাক্ হয়ে রইল। উপক না বললেও তার উপস্থিতির পূর্বাপর সব কিছুই আজ হতে এগার বছর পূর্বে প্রথম সাক্ষাতেই বুদ্ধ জেনে ফেলেছিলেন। এ কারণে তিনি উপকের গৃহত্যাগে ও শ্রাবস্তী আগমনে আশ্চর্যচকিত হন নি। সব জানা সত্ত্বেও সৌজন্যতা রক্ষার্থে উপকের কুশল-মঙ্গল জিজ্ঞেস করেন। জিজ্ঞেস করতেই উপক তার পারিবারিক ও মানসিক অশান্তির ইতিবৃত্তান্ত খুলে বলেন। সব বলা হলে উপক কাতর প্রার্থনা জানান- 'প্রভু অনন্ত-জিন, আমায় রক্ষা করুন। উদ্ধার করুন। অনুগৃহীত হবে এ শরণাপন্ন দাস।'

গার্হস্থ্য জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতময় কটু-তিক্ততায় উপকের মধ্যে বহুপূর্বেই পুনরায় বৈরাগ্যভাবের উদয় হয়েছে। পরচিত্ত-বিজানন-জ্ঞানযুক্ত অভিজ্ঞাবলে বুদ্ধ তা জানেন। কাজেই অনাবশ্যক প্রারম্ভিক ধর্মোপদেশ না দিয়ে বৈরাগ্য-ভাবোদ্দীপক ধর্মোপদেশ শুনিয়ে উপকের উদ্বিগ্নতা কমালেন। উপকের চিত্তের বিক্ষিপ্তভাব শান্ত হয়েছে জেনে বুদ্ধ বলেন -

'সত্য'কে 'সত্য'রূপে, এবং 'অসত্য'কে 'অসত্য'রূপে জানার চেষ্টা করো। সত্যই একমাত্র শান্তিকর। সত্যেই শান্তির বাস। অসত্যই

অশান্তিকর আর অসত্যেই অশান্তির বাস।

উপক - 'সত্য' কি? অসত্য কি?

সত্যাসত্যের স্বরূপ বা পরিচয় কি?

কারও মতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।

কারও মতে জগৎ সত্য, ব্রহ্ম মিথ্যা।

কারও মতে আত্মা সত্য, শরীর মিথ্যা।

কারও মতে সত্য নিত্য, শেষ অনিত্য।

কারও মতে মায়া সত্য, শেষ মিথ্যা।

কারও মতে কাল সত্য, শেষ মিথ্যা।

কারও মতে সত্য সত্ত্বার অন্তর্নিহিত সার।

কারও মতে সত্য সত্ত্বার বহির্ভূত সার।

কারও মতে সত্য সাকার। পূরুষাকার।

কারও মতে সত্য নিরাকার। গুণাধার।

কারও মতে সত্য সাকার ও নিরাকার দু'ই।

কারও মতে সত্য ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়। কারও মতে সবই সত্য। কারও মতে সবই মিথ্যা। নানা মুনির নানা মত। যত মত তত পথ। সত্য রহস্যাবৃত।

প্রভু। আপনি বলুন- কোন্‌টি স্বীকার্য আর কোন্‌টি অস্বীকার্য?

বুদ্ধ - সত্য অখণ্ডনীয়। যা খণ্ডনীয় আমার মতে, তা মিথ্যার বা মায়ার সামিল। কি খণ্ডনীয় আর কি অখণ্ডনীয় তা আস্থায় বা অন্ধ-বিশ্বাসে

জানা যায় না। তা প্রত্যক্ষীভূত করার বিষয়। আমার বা পরের কথায় তা মেনে নেবে কেন? নিজে এসে দেখ। পরখ কর। ইহ-জীবনে, এখানে এবং এখন যা অনুভব-সত্য তাকেই সত্যরূপে স্বীকার করবে। যা অননুভবনীয় তাকে সত্য বলে স্বীকার করার কোন যৌক্তিকতা নেই।

উপক - সত্য এক না অনেক? ঋষি-মুনি দার্শনিকের অনেকে একে এক এবং অদ্বিতীয় বলে ব্যাখ্যা করেন। আবার অনেকে অনেক বলেও মত প্রকাশ করেন। কেহ বলেন- সত্যই ঈশ্বর। কেহ বলেন- ঈশ্বরই সত্য। সত্য কি তবে সত্যই বহুরূপী? এ ব্যাপারে আপনার কি মত?

বুদ্ধ - সংসারের আদি বা অন্ত বিষয়ক সমস্যা দার্শনিক সমস্যা মাত্র। অনাদি-অনন্ত কাল ধরে এসব সমস্যার সমাধান বের করার আপ্রাণ চেষ্টা চলে আসছে। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রমাণের অভাবে আজ অবধি কোন সর্ব-সম্মত ও তর্ক- সঙ্গত সমাধান পাওয়া যায় নি। ভবিষ্যতেও, এর সম্ভাবনা নেই। সমস্যার সাময়িক সমাধান হয়ে গেলেও সেই সমাধান শোক-সন্তপ্ত দুঃখ-পীড়িত মানব তথা প্রাণী- জগতের পরিপূর্ণ ও স্থায়ী দুঃখ-লাঘবে বিন্দুমাত্র সহায়ক হবে না। সে সব সমস্যার সমাধানজনিত চিন্তায় সমস্যা বাড়ে বৈ কমে না। যা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয় তা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের তুলনীয় হতে পারে না। নিজের ঔরসজাত পুত্র কি কখনও বন্ধ্যা-পুত্রের তুলনীয় হতে পারে? মানা না মানায় সত্যের স্বরূপ বিকৃত হয় না। সত্য অনুমান বা তর্কের বিষয় নয়। তা তর্কাতীত।

উপক - তা হলে উপায় কি? আমি কি তা জানতে পারবো?

বুদ্ধ - সত্য অনুভবনীয় বিষয়। জ্ঞানীজন মাত্রেরই তা বোধগম্য। অজ্ঞানীর নিকট তা দুর্গম ও দুর্ভেদ্য রহস্য।

সুখ, শান্তি ও সত্য কামীকেও তা বর্জন করার পরামর্শ দিয়ে থাকি।

উপক - ঐ দু পথ বর্জিত হলে অবশেষ তো আর কিছুই রয় না। তবে কোন্ পথে আপনি সত্যের সন্ধান ও উদ্ঘাটন করলেন? আপনার কি আবার ঐ দু পথ ভিন্ন পৃথক্ পথ রয়েছে?

বুদ্ধ - ঐ দুই অতি (অন্ত) বর্জন করে এক অভিনব মার্গ আবিষ্কার করেছি। এ মার্গের নাম 'মধ্যম মার্গ'। এ মার্গ অবলম্বন করে আমি চির রহস্যাবৃত সত্য উদ্ঘাটনে সমর্থ হয়েছি।

পরম সুখ, শান্তি ও সত্যের সন্ধানে সুক্ষ্ম-অনুভূতির প্রয়োজন। স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম অনুভূতির জন্যে প্রয়োজন প্রশান্ত মন ও সূক্ষ্ম মানসিক শক্তির। সবল শারীরিক শক্তি বা বাহু-বল না হলেও ক্ষতি নেই, তবে সুস্থ মন-মানসিকতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সুস্থ শরীর নিতান্তই আবশ্যক। সুস্থ শরীর ধারণে চাই নিয়মিত ও পরিমিত পৌষ্টিক আহার। কারণ প্রাণী-মাত্রেরই জীবন আহারাশ্রিত।

উপক - আপনার এই নবাবিষ্কৃত মধ্যম পথ দুই নৌকোয় পা রাখার মতো বিপজ্জনক নয় তো? জন-সমাজের বহুল প্রচলিত প্রবাদানুসারে দুই নৌকোয় পা রাখতে নেই।

বুদ্ধ - নয়, নয়। মধ্যম পথ অবলম্বন করা দুই নৌকোয় পা রাখা নয়। এটা ভ্রান্ত ধারণা। বিপথগামী দুই নৌকো বর্জন করে লক্ষ্যপথে চালিত তৃতীয় স্বতন্ত্র নৌকোয় পা রাখাই আমার মধ্যম পথ।

উপক - এই মধ্যম পথে চলতে হলে সাধককে কি কি করতে হয়?

বুদ্ধ - মধ্যম পথ কোনো এক তন্ত্র বা তত্ত্বে তৈরী নয়। আটটি বিশেষ গুণবিশিষ্ট মানসিক স্থিতিকে মধ্যম মার্গ বলা হয়। আটটি বিশেষ গুণ বলতে সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্

উপক - বহির্মুখী মন অন্তর্মুখী হয় কিভাবে? এর জন্য সুখ-শান্তি ও সত্য গবেষককে কোন্ মার্গ অবলম্বন করতে হয়? আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বুঝেছি সাংসারিক কামনা-বাসনায় চিত্ত কলুষিত হয়। চঞ্চল হয়। আমার মনে হচ্ছে এ চঞ্চল চিত্তকেই আপনি বহির্মুখী বলে সংকেত করতে চাচ্ছেন। তাই নয় কি?

বুদ্ধ - হ্যাঁ, আয়ুষ্মান উপক! তোমার ধারণা আংশিকভাবে সত্য। চঞ্চল চিত্ত সর্বদাই বহির্মুখী। তবে বহির্মুখী চিত্ত সব সময় সবার চঞ্চল হয় না। ব্যক্তির মানসিক স্থিতির উপর তা নির্ভর করে।

সমাজে সুখান্বেষণের দুটি পরম্পরাগত পন্থা রয়েছে। একটি হল শারীরিক সুখ-সেবন-মূলক পন্থা আর অপরটি হল শরীর-পাতন-মূলক কৃচ্ছ্র-সাধনের (পন্থা)। উভয় পন্থারই অভিজ্ঞতা আমার আছে।

এ দুয়ের মধ্যে কাম-সেবন-জনিত সুখই সর্বাধিক সহজ ও সুলভ। তবে এ সুখ অতি হীনমানের। এ সুখ এবং এ সুখ-সাধনের মার্গ মানব-সমাজের অতিহীন, গ্রাম্য, পৃথগ্‌জন ও অনার্য-জন সেবন-যোগ্য। এ মার্গ ক্ষণিক সুখ দান করে। কিন্তু এর সাথে অহিতকারী অপার সমস্যারও সৃষ্টি করে। সুখ, শান্তি ও সত্য সন্ধানীর সহায়ক না হয়ে তা বাধকরূপে ক্রিয়া করে।

কৃচ্ছ্র-সাধন-মার্গ কাম-সুখ-সেবন-মার্গ অপেক্ষা অধিক কষ্ট-সাধ্য। এ মার্গে অপেক্ষাকৃত উন্নত-মানের সুখ লাভ হয়। তবে অভীষ্ট সুখাপেক্ষা প্রাপ্ত সুখ তুলনায় অতি তুচ্ছ। অভীষ্ট ও প্রাপ্ত সুখাপেক্ষা সৃষ্ট অনর্থক ও অহিতকারী সমস্যাই অপার। এ মার্গে প্রাপ্ত সুখ কিছুটা উন্নতমানের হলেও তা মোটেই আর্য-জন-যোগ্য নয়। অভীষ্ট সুখ, শান্তিও সত্য সন্ধানে সহায়কও হয় না।

এ সব দোষের কারণে আমি ঐ দুই চরম পন্থা বর্জন করেছি। অপর

উপক - সত্যের অবস্থান কোথায়? একে পেতে কোথায় যেতে হয়?

বুদ্ধ - সত্য সর্ব-ব্যাপক। এ কোন এক ব্যক্তি বা দেশ বিশেষের গুণ বা সম্পত্তি নয়। এদেশে ওদেশে এখানে ওখানে সর্বত্রই সত্য বিরাজমান। সত্য অনুভবের বিষয়। তা হওয়ায় যে যেখানে অবস্থান করে সে সেখানে থেকে সত্যকে অনুভব করতে পারে। তবে একে অনুভব করতে হলে অনুভূতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তরে পৌঁছতে হবে। কেহ কাহারও হয়ে সত্য অনুভব করতে পারে না। নিজেকেই তা করতে হয়। সত্যকে জানতে হলে বহির্যাত্রার প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন অন্তর্যাত্রার।

উপক - অন্তর্যাত্রার অর্থ কি?

বুদ্ধ - যাত্রা দু রকমের। প্রথমটি বহির্যাত্রা আর অপরটি অন্তর্যাত্রা। যে যাত্রায় কেবল বহির্জগতের জ্ঞান হয় তা বহির্যাত্রা। আর যে যাত্রায় ব্যক্তির অন্তর এবং বহির্জগতের উভয়ের জ্ঞান হয় তা অন্তর্যাত্রা।

উপক - তা কি করে সম্ভব?

বুদ্ধ - তরঙ্গায়িত জলে কেহ নিজের প্রতিবিম্ব পরিষ্কার দেখতে পায় না। এবং তরঙ্গায়িত জলপূর্ণ পাত্রের গভীরতার অনুমানও তার হয় না। অনুরূপভাবে পাঁচটি কায়িক ইন্দ্রিয়ে সংশ্লিষ্ট বহির্মুখী চঞ্চল-চিত্তে ব্যক্তি তার চিত্তের বিশালতা এবং সর্বব্যাপক সত্যের স্বরূপ জানতে পারে না। নিষ্প্রকম্পমান পাত্রস্থ জলে ব্যক্তি নিজের প্রতিবিম্ব দেখার সাথে পাত্রের গভীরতা সম্পর্কেও সে যেমন এক নির্ভুল ধারণা নিতে পারে, ঠিক সেভাবে নিষ্প্রকম্পমান চিত্তেই চিত্তের বিশালতা এবং সর্ব-ব্যাপক সত্যের স্বরূপ জানতে পারে। প্রয়োজন শুধু বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করা।

আজীবিকা, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধিকে বোঝায়।

উপক - প্রভু অনন্তজিন! এ আটটি অঙ্গের ব্যাপারে আমি অপরিচিত। একটু বিশদাকারে ব্যাখ্যা করলে উপকৃত হব।

বুদ্ধ - বেশ, তাহলে প্রথমে সম্যক্ দৃষ্টি সম্পর্কেই বলি। আমরা যে জগতে রয়েছি তা দু-ধরণের তত্ত্বে পূর্ণ- এক জড়-জগৎ, অপরটি জীব জগৎ। জড় জগৎ নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়। কিন্তু জীব নিজের এবং পারিপার্শ্বিক জড় ও জীব উভয় জগত সম্পর্কে সচেতন। প্রাণীর নিকট এবং বিশেষ করে মানবের নিকট এই দুই জগতকে জানবার জন্যে ছয়টি ইন্দ্রিয় আছে। এদের একটি মন-ইন্দ্রিয় আর পাঁচটি কায়িক ইন্দ্রিয়। কোন কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে ঐ পাঁচ কায়িক ইন্দ্রিয়ের এক বা একাধিক ইন্দ্রিয় কম থাকে। ঐ পাঁচ কায়িক ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটিরই পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় রয়েছে। মন-ইন্দ্রিয়েরও নিজস্ব ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য (চিন্তনীয়) বিষয় রয়েছে। এ ছাড়া উপরোক্ত পাঁচ কায়িক-ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ও মন-ইন্দ্রিয়ের বিষয়। যখনই এক বা একাধিক কায়িক ইন্দ্রিয় নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শে আসে তখনই সংস্পর্শে জাত ভাল বা মন্দ, অনুকল বা প্রতিকুল অনুভূতির ভিত্তিতে ঐ ঐ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় সম্পর্কে ব্যক্তির (মনে) এক দৃষ্টি বা ধারণার সৃষ্টি হয়। একে মত বা অভিমতও বলা যেতে পারে। দৃষ্টি দু ধরণের হয়- সম্যক্ দৃষ্টি এবং মিথ্যাদৃষ্টি।

ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অস্তিত্ববান বস্তু বা জীবের অস্তিত্ব দু প্রকারের- এক বাহ্যিক স্থিতির রঙ্গ-রূপ, আকার-প্রকার দেখে শুনে; রস-গন্ধ গ্রহণ করে এবং স্পর্শ করাকালে যে আপাত দৃষ্টির সৃষ্টি হয় তা মিথ্যা-দৃষ্টি। কারণ বস্তু ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ গোচরীভূত করা-কালে মন অবিদ্যা

অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। সাথে বস্তুর বাহ্যিক স্থিতির সামান্য জ্ঞান অবিদ্যার অন্ধকারের নাশক নয়, বরংচ তা অবিদ্যাবর্ধক। এ কারণে এ ধরণের ভ্রামক দৃষ্টিকে মিথ্যাদৃষ্টি বলা হয়। সংসারে বাষট্টি প্রকারের মিথ্যাদৃষ্টি রয়েছে। ব্রহ্মজাল-সূত্রে এই বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টির বিশদ্ ব্যাখ্যা করেছি। এখানে ও সবের বিশদ্ ব্যাখ্যা করা সমীচিন হবে না।

এই বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি বিবর্জিত দৃষ্টিকে সম্যক্ দৃষ্টি বলা হয়। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর বস্তুস্থিতির যথাভূত-জ্ঞানই সম্যক্ দৃষ্টি। পরমার্থত দুঃখ-আর্য-সত্যের জ্ঞান এবং দুঃখ-নিরোধ-গামিনী প্রতিপদার জ্ঞান-জাত দৃষ্টিই সম্যক্ দৃষ্টি।

ব্যক্তির জীবনমান নির্ধারণে 'দৃষ্টি'র ভূমিকা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। একবার কোন কারণে কোন এক ব্যক্তি, বা বস্তু বা এই সংসার সম্পর্কে কোন দৃষ্টি তৈরী হলে তা পরিবর্তন না করা অবধি মানুষ বা প্রাণী মদাসক্তের ন্যায় ঐ 'দৃষ্টি'- পরিচালিত এক বিশেষ পথে চালিত হয়। মিথ্যা দৃষ্টির প্রভাবে মানুষ ক্রমশ মিথ্যাচার-সম্পন্ন হয়। চরমে পৌঁছে শান্ত-শিষ্ট স্বভাব ছেড়ে অঙ্গুলীমালের ন্যায় হিংস্রক নরঘাতকে পরিণত হয়। আবার সম্যক্ দৃষ্টির প্রভাবে ঐ মানুষ সদাচারে লিপ্ত হয়। ক্রমশ সদাচারী জীবনের চরমতা প্রাপ্ত হয়ে সে জন-সমাজের আদর্শ-স্থানীয় বরণীয় ও পূজনীয় হয়। অতএব জ্ঞানীজন-মাত্রেরই কর্তব্য সম্যক্ দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া।

উপক - আহা! চমৎকার, চমৎকার। এইত এবার পরিষ্কার বুঝেছি মানবের জীবনে 'দৃষ্টি'র ভূমিকা কতখানি গুরত্ব-পূর্ণ। সম্যক্ সংকল্প কি?

বুদ্ধ - মানব মনে কোন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর সংস্পর্শজাত অনুকূল

অনুভূতির কারণে প্রিয়বস্তুর বা ব্যক্তির সান্নিধ্য পাবার এবং প্রতিকূল অনুভূতির কারণে অপ্রিয় বস্তু বা ব্যক্তির সান্নিধ্য বর্জনের তীব্র ইচ্ছা জন্মে। তীব্র ইচ্ছা-পূর্তির উদ্দেশ্যে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হতে হয়। একেই বলে সংকল্প। সংকল্প দু প্রকারের- মিথ্যা-সংকল্প ও সম্যক্-সংকল্প। যে সংকল্পের পরিণামে আত্ম, পর ও বহুজনের হিত সাধিত হয় তা সম্যক্ সংকল্প। বিশেষত পরের অহিত সাধক প্রদূষিত চিত্ত প্রশমনের সংকল্পই সম্যক্ সংকল্পের প্রথম অঙ্গ। আত্ম, পর ও বহুজনের হিতার্থে মৈত্রী-ভাব সম্প্রসারণের সংকল্প সম্যক্-সংকল্পের দ্বিতীয় অঙ্গ। বৈরাগ্যভাবোদ্দীপক সংকল্প সম্যক্-সংকল্পের তৃতীয় অঙ্গ। এই তিন প্রকারের সংকল্প পরম সুখ, শান্তি ও সত্য উদ্ঘাটনে সহায়ক হয় এবং সাধককে সম্যক্ পথে চালিত করে। এ কারণে এই তিন সংকল্প-জনিত সাধকের সশক্ত মানসিক স্থিতিকে একত্রে সম্যক্ সংকল্প বলা হয়। দৃষ্টি সম্যক্ হলে সংকল্পও সম্যক্ হয়। সম্যক্ দৃষ্টি সম্যক্ সংকল্পের পূর্বগামী কারণ (পুরোহিত বীজ) সদৃশ। সম্যক্ সংকল্প ব্যতীত কোন শুভ কর্ম সম্পাদন সম্ভব নহে।

উপক - অনন্তজিনের দর্শনলাভে আমার পরম লাভ হয়েছে। যতই শুনছি ততই শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে। এ শোনার যেন শেষ নেই। মনে হয় কান পেতে কেবল শুনে যাই। ভন্তে, এবার বলুন - বাণী কি করে সম্যক্ হয়?

বুদ্ধ - দৃষ্টির পর সংকল্প গ্রহণ যেমন স্বতঃ সিদ্ধ, সংকল্পের পর শব্দাকারে সংকল্পের অভিব্যক্তিও তেমন স্বতঃসিদ্ধ। সংকল্প গ্রহণে সংকল্প-কর্তার মানসিক শক্তি কেন্দ্রীভূত ও সঞ্চিত হয়। বারম্বার একই বিষয়ে মনন, পুনর্চিন্তন ও সংকল্প গ্রহণ করলে সঞ্চিত মানসিক শক্তি শব্দাকারে বিস্ফোটিত হয়। শব্দ বা বাণীর মাধ্যমে সংকল্প-কর্তার সুপ্ত মনোভাব ব্যক্ত হয়। বাণী দু প্রকারের - মিথ্যা ও সম্যক্। মিথ্যে,

ভেদ, কটু ও অনর্থক কথা বলা মিথ্যে-বাণীর অন্তর্গত হয়। এর বিপরীত উপরোক্ত মিথ্যে-কথা বলা হতে বিরত থাকাই সম্যক্ বাণী। মধ্যম পথ অবলম্বনকারীরা সর্বদাই সম্যক্ ও মধুর বাণী উচ্চারণ করেন। তাঁরা কখনও অপ্রিয় ও অসত্য বাক্য প্রয়োগ করেন না। প্রিয় অসত্য বাক্যেরও প্রয়োগ তাঁরা কখনও করেন না। স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে অপ্রিয় সত্য-বাণীর প্রয়োগ করেন। প্রিয় সত্য বাক্যই তাঁরা সর্বদা প্রয়োগ করেন।

উপক - সত্যিই, জিন-বাণী সম্যক্ বাণী। সত্যিই, জিন-বাণী মধুর বাণী।

বুদ্ধ - মধ্যম পথের পরিপূরক চতুর্থ অঙ্গ - সম্যক্ কর্ম। প্রাণী মাত্রকেই প্রতিপল কোন না কোন কর্ম-সম্পাদনে লিপ্ত ও ব্যস্ত থাকতে হয়। অন্য কথায় বলা যেতে পারে কর্মহীন প্রাণী নেই।

কর্ম বীজ-সদৃশ। বীজ বপিত হলে তা মৃত্তিকা, জলবায়ুর পরিচর্চার দোষ-গুণানুসারে এক নির্দিষ্ট সময়ান্তরালে ফল-দান করে। সাধারণ কথায় বলা হয়- **"যাদিসং বপতে বীজং তাদিসং হরতে ফলং।"**

বীজ যেমন নানা প্রকারের, কর্মও তেমন নানা প্রকারের হয়। নানাপ্রকারের হলেও মোটামুটি কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। দুয়ার-ভেদে কর্ম তিন প্রকারের - কায়িক কর্ম, বাচনিক কর্ম ও মানসিক কর্ম। মানসিক কর্ম অর্থাৎ কর্ম-সম্পাদনের ইচ্ছা,মানসিক প্রয়াস সংকল্প ও কোন এক নির্দিষ্ট কর্ম- সম্পাদনের ইচ্ছা ও সংকল্প বারম্বার করলে এতে সংকল্প-কর্তার মানসিক শক্তি বিকশিত বা কেন্দ্রীভূত এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এমন এক সময় আসে সেই কেন্দ্রীভূত এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মানসিক শক্তি বিকশিত বা বিস্ফোটিত হয়ে শব্দাকারে মুখ-দ্বার দিয়ে ব্যক্ত হয়। শব্দোচ্চারণের মাধ্যমে মুখ দিয়ে যে কর্ম

সম্পাদিত হয় তা বাচনিক কর্ম। ক্রমে তা কায়দ্বার দিয়ে রূপায়িত হয়। কায়দ্বার দিয়ে রূপায়িত কর্মকে কায়িক কর্ম বলা হয়। সামান্যত কায়িক কর্মের চেয়ে বাচনিক কর্মের সংখ্যা অধিক হয়ে থাকে। বাচনিক কর্মের চেয়ে মানসিক কর্মের সংখ্যা অধিক হয়। নৈতিকতা ভেদে কর্ম দু প্রকার- কুশল (পুণ্য) ও অকুশল (পাপ)। যে কর্মের মূলে আত্ম, পর ও বহুজন-হিত-সাধনের কল্যাণ-কামনা জড়িত থাকে তা কুশল (পুণ্য) কর্ম। যে কর্মের মূলে আত্ম-হিত, পর-হিত ও বহুজন-হিত বিনাশের অকল্যাণ-কামনা জড়িত থাকে তা অকুশল (পাপ) কর্ম।

দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, প্রজ্ঞা, বীর্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা ভেদে কুশল-কর্ম দশ প্রকার। এর বিপরীত অকুশল-কর্মও দশ প্রকারের। কর্মকে মিথ্যা ও সম্যক্ কর্ম ভেদেও বিভক্ত করা হয়। সংক্ষেপে প্রাণী হত্যা, চুরি এবং ব্যাভিচার জনিত কায়িক কর্ম মিথ্যা-কর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়। এসব কায়িক কুকর্ম হতে বিরত থাকাকে সম্যক্ কর্ম বলা হয়।

তৃষ্ণা যত বেশী বাড়ে কর্মও তত বেশী অধিক সম্পাদিত হয়। তৃষ্ণা যত বেশী বলবতী হয় তা হতে সম্পাদিত কর্মের ফল (বিপাক)ও তত বেশী শক্তিশালী হয়। বীজ-ভেদে ফল যেমন বিভিন্ন প্রকারের হয় অনুরূপভাবে কর্মভেদেও কর্ম-বিপাক (ফল) বিভিন্ন প্রকারের হয়। অকুশল কর্ম সর্বদাই দুঃখদায়ক হয় এবং দুর্গতি প্রদান করে। কুশল কর্ম সব সময়ই সুখ ও সুগতি প্রদান করে। কুশল কর্ম আবার দুভাগে বিভক্ত লৌকিক ও লোকোত্তর। লৌকিক কুশল কর্ম (অর্থাৎ কামাবচর কুশল কর্ম, রূপাবচর কুশল কর্ম, অরূপাবচর কুশল কর্ম) কুশল-বিপাক প্রদান করে। কিন্তু লোকোত্তর কুশল কর্ম (হেতুমুক্ত হওয়ায়) কুশল বা অকুশল কোন বিপাকই প্রদান করে না। তবে তা তৃষ্ণা-

ক্ষয়ের মাধ্যমে পুরাতন দুর্বল কর্ম-বিপাক ক্ষয় ও ধ্বংসে সহায়ক হয়। অন্তিমে পরম সুখ, শান্তি ও সত্য সন্ধানেও পরিপূরক হয়। সম্যক্ কর্ম প্রথম দিকে লৌকিক কুশল-কর্মের ভূমিকা পালন করে। এর নিরন্তর প্রয়াস ও আচরণের পরিণামে তা পরবর্তী-কালে লোকোত্তর কর্মের ভূমিকাও পালন করে। একারণে সম্যক্ কর্ম-সম্পাদনকারীর দুঃখ ক্রমশ হ্রাস পায়। সুখ নিরন্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অন্তিমে সে পরম সুখ, শান্তি ও সত্যের সান্নিধ্য লাভ করে।

উপক - ভগবান, বুঝলাম আপনার কর্ম-সিদ্ধান্ত। তৃষ্ণার বৃদ্ধিতে কর্ম ও কর্ম-বিপাকের বৃদ্ধি। অকুশল কর্মের বৃদ্ধিতে সমস্যার বৃদ্ধি। সমস্যার বৃদ্ধিতে দুঃখের বৃদ্ধি। তৃষ্ণার হ্রাসে কর্মের ও কর্ম-বিপাকের হ্রাস। কর্ম ও কর্ম-বিপাকের হ্রাসে সমস্যার হ্রাস। সমস্যার হ্রাসে দুঃখের হ্রাস। প্রাণী তৃষ্ণা-শূন্য হলে কর্ম-শূন্য হয়। কর্ম-শূন্যে সমস্যা-শূন্য হয়। সমস্যা-শূন্য হলেই প্রাণী দুঃখ-শূন্য হয়। এটাই মুক্তি। এটাই বিমুক্তি। তাই না, ভন্তে?

বুদ্ধ - হ্যাঁ উপক, ঠিক বুঝেছ তুমি।

উপক - সম্যক্ আজীবিকা কি, ভন্তে?

বুদ্ধ - প্রাণী মাত্রেরই জীবন আহারাশ্রিত। হিংস্র সবল প্রাণীরা অন্য দুর্বল প্রাণীদের বধ করে জীবন ধারণ করে। তৃণভোজী প্রাণী প্রকৃতি-জাত তৃণ, ফল, মূল, পত্রাদি আহরণ করে আহার করে। আহার-ভেদে মানবজাতি তিন প্রকারের। আমিষ ভোজী, নিরামিষ ভোজী ও সর্বভূক। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজ-বদ্ধ জীবের প্রত্যেকের কর্তব্য একের স্বার্থ-সিদ্ধিতে যেন অপরের স্বার্থ বিঘ্নিত না হয় তার দৃষ্টি রাখা। জীবন-ধারণের মৌলিক অধিকার হতে কেহ যেন বঞ্চিত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখাও সমাজবদ্ধ জীবের প্রধান লক্ষণ। এ কারণে এক

নির্দ্ধারিত শ্রম ও অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় বা আদান-প্রদানের বিধি-বিধান সমাজে প্রচলিত হয়। মানবের জীবন-ধারণে আহার ব্যতীত বস্ত্র, বাসস্থান ও পথ্যের প্রয়োজনও অত্যাবশ্যক। এ চার অত্যাবশ্যক সামগ্রীর সংগ্রহার্থে মানুষকে অর্থ-উপার্জন করতে হয়। অর্থ-উপার্জনের বিবিধ উপায় রয়েছে। জীবিকা নির্বাহের এই বিবিধ উপায় বা পেশাকে আজীবিকা বলা হয়। আজীবিকা মোটামুটিভাবে দু প্রকার। সম্যক্ আজীবিকা ও মিথ্যা আজীবিকা। অস্ত্র-শস্ত্র, দাস-দাসী, সুরা-মাদক দ্রব্য, প্রাণীহত্যা ও প্রাণনাশক বিষাক্ত দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয়ের আজীবিকাকে মিথ্যা-আজীবিকা বলা হয়।

উপরোক্ত মিথ্যা-আজীবিকা বর্জিত অন্য সব আজীবিকাকে সম্যক্ আজীবিকা বলা হয়। সম্যক্ আজীবিকা আবার গৃহী ও ভিক্ষুর জীবনস্তর ভেদে দু প্রকার। গৃহীগণের সম্যক্ আজীবিকা মোটামুটিভাবে তিন প্রকার। কৃষিকর্ম, চাকরী-বাকরী সরকারী (রাজ-সেবক) বা বেসরকারী (স্বতন্ত্র) ও ধর্মসম্মত অনিষিদ্ধ ব্যবসা। মুক্তিকামী গৃহত্যাগী সাধু-সন্ত, মুনি-ঋষি, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, শ্রামণের-শ্রামণেরীগণের পক্ষে মধুকরী-ব্রতে ভিক্ষান্ন-সংগ্রহের আজীবিকা সম্যক্ আজীবিকা।

উপক - ভগবান, আপনার অপার অনুকম্পায় সম্যক্ আজীবিকা ও মিথ্যা আজীবিকার প্রভেদ পরিষ্কার হল। কিন্তু এ দুয়ের সাথে সুখ, শান্তি ও সত্যের সম্বন্ধ কোথায়? তা তো বুঝতে পারছি না।

বুদ্ধ – মিথ্যা আজীবিকায় প্রচুর অর্থোপার্জন হয়। এতে প্রচুর সাময়িক সুখাগমও হয়। তবে প্রতি পদে নিন্দিত ও বিপদ-গ্রস্ত হবার ঝুঁকি নিয়ে চলতে হয়। প্রতি পদে সমাজে মান, যশ, লাভ, সুখ হানির সম্ভাবনা থাকে। ভয় উৎপন্ন হয়। চিত্ত কলুষিত হয়। কলুষিত চিত্ত

চঞ্চল হয়। চঞ্চল চিত্তে শান্তি বিনষ্ট হয়। অশান্তির সৃষ্টি হয়। মিথ্যা আজীবিকা-জনিত কুকৃত্যের বিপাক পরিপক্ক হলে দৈব দুর্বিপাকে, প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় ও মতিভ্রমের কারণে স্বোপার্জিত ধন অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিমেষেই পরহস্তগত হয়। পর্বত-প্রমাণ অশান্তির মাঝে কালাতিপাত করে মৃত্যুমুখী হয়ে দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

সম্যক্ আজীবিকায় সাধারণত সহজে প্রচুর ধনাগম হয় না। তবে সম্যক্ আজীবিকায় যে প্রচুর ধনাগম একেবারে অসম্ভব তাও নয়। ধনাগম কম হওয়ায় সুখাগমও মাত্রায় কম হয়। তবে যতটুকু হয় তা দীর্ঘস্থায়ী ও সার্থক হয়। এতে বিপদের ঝুঁকি অপেক্ষাকৃতভাবে কম থাকে। কষ্টার্জিত ধনের ব্যয় নিশ্চিন্তে ও সুব্যবস্থিত ভাবে করা যায়। অব্যবস্থিত অধিক ব্যয়ে যে সুখ লাভ হয় সুব্যবস্থিত পরিমিত ব্যয়েও ততোধিক সুখ লাভ হয়। সম্যক্ আজীবিকায় ধন-উপার্জনকালে, উপার্জিত ধনের ব্যয়কালে ও সুখ-উপভোগ-কালে মনে কোন দুশ্চিন্তা থাকে না। সমাজে মান, যশ, লাভ, সুখ, সমৃদ্ধি হানিরও কোন ভয় থাকে না। চিত্ত কলুষিত হয় না। অকলুষিত চিত্ত চঞ্চল হয় না। অচঞ্চল চিত্তে সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সুখ-শান্তির নিরন্তর বৃদ্ধি হয়। সম্যক্ আজীবিকা-জনিত পুণ্য কর্মের বিপাক পরিপক্ব হলে দৈব-যোগে আকস্মিক ধনলাভও ঘটে। সুখ-শান্তির মধ্যে কালাতিপাত করে মৃত্যুর পর সুগতি প্রাপ্ত হয়।

এভাবে সম্যক্ আজীবিকার সাথে মানব জীবনের পরম লক্ষ্য সুখ, শান্তি ও সত্যের অভিন্ন সম্বন্ধ বিদ্যমান। এ কারণে সুখ, শান্তি ও সত্য প্রার্থী প্রত্যেকেরই প্রথম কর্তব্য সম্যক্ভাবে সম্যক্ আজীবিকার চয়ন করা। সম্যক্ আজীবিকার চয়নে ও অনুশীলনে মধ্যম মার্গের অবশিষ্ট অঙ্গ-পরিপূর্তির পথ প্রশস্ত হয়।

উপক - দুর্বোধ্য বিষয় এবারে একেবারে জলবৎ তরলং হয়ে গেছে।

বুদ্ধ - এবার সম্যক্ ব্যায়ামের কথায় আসা যাক্।

উপক - ব্যায়ামের কথা অনেক শুনেছি। নিজেও করেছি। উরুবেলায় আর আমাদের নালাগ্রামের ছেলে, বুড়ো এবং বিশেষ করে যুবক সাধু-সন্যাসীরা সকাল-সন্ধ্যায় ব্যায়ামশালায় বা আশ্রমে ব্যায়াম করেন। শীর্ষাসন, মৎস্যাসন, ময়ুরাসন, শবাসন, বজ্রাসন, সুখাসন ইত্যাদি অনেক রকম আসন রয়েছে ব্যায়াম করার। মল্লযোদ্ধা, মুষ্টিযোদ্ধারাও নিয়মিত ব্যায়াম করে থাকেন। ব্যায়ামে দুঃস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়, দুর্বল সবল হয়, রোগী নীরোগ হয়, আরও কত কি। এসব বুড়োবুড়ীদের কাছে শুনেছি। আপনাকে দেখতে তো বেশ সুন্দর, সুস্থ ও সবল দেখাচ্ছে। আপনার শিষ্যরাও দেখতে বেশ সুন্দর, সুস্থ ও সবল। আপনাদের আর ব্যায়ামের প্রয়োজন কিসের? দিনে কবার করেন? কোন্ কোন্ আসনে আপনাদের বেশী রুচি?

বুদ্ধ - ব্যায়াম কেবল দুঃস্থকে সুস্থ, দুর্বলকে সবল আর রোগীকে নীরোগ করার জন্যই নয়। সুস্থকে অধিককাল সুস্থ, সবলকে অধিককাল সবল আর নীরোগীকে অধিককাল নীরোগ রাখার জন্যও ব্যায়ামের প্রয়োজন। আমাদের ব্যায়াম প্রতিক্ষণের। পদ্মাসনে, অর্দ্ধপদ্মাসনে, সুখাসনে রুচি বেশী। ব্যায়াম দু প্রকার। শারীরিক ব্যায়াম ও মানসিক ব্যায়াম।

উপক - এ দুটোর মধ্যে নিশ্চয়ই শারীরিক ব্যায়াম অধিকতর কষ্টকর।

বুদ্ধ - না, তা নয় শারীরিক ব্যায়াম অপেক্ষা মানসিক ব্যায়ামই অধিক কষ্টসাধ্য।

উপক - এর উত্তর বড়ই সরল । মন তো তুলোর চেয়েও বেশী

তুল্‌তুলে নরম। শরীরের মাংস সে অপেক্ষা অনেক শক্ত। তার চেয়েও কঠিন হল অস্থি, কঙ্কাল ও মেরুদণ্ড আদি। কঠিনকে করায়ত্ত ও ইচ্ছানুসারে বিকৃত করাই কঠিন।

বুদ্ধ - উপক, প্রশ্ন করি। যা স্থূল তাকে ধরা সহজ, না যা সূক্ষ্ম তাকে ধরা সহজ?

উপক - কেন? স্থূল বস্তুকে ধরা-ছোঁয়া সহজ। আর সুক্ষ্মকে ধরাই কঠিন কাজ।

বুদ্ধ - যার আকার আছে, প্রকার আছে, রঙ্গ আছে, রূপ আছে তাকে ধরা সহজ, না যার এসব নেই তাকে ধরা সহজ?

উপক - যার আকার আছে, প্রকার আছে, রঙ্গ আছে, রূপ আছে তাকে ধরা-ছোঁয়া সহজ। আর যার এসব নেই তাকে ধরা দুষ্কর ব্যাপার।

বুদ্ধ - যা দুরন্ত তাকে শান্ত করা কঠিন কাজ, না, শান্তকে শান্ত করা, স্থিরকে স্থির রাখা কঠিন?

উপক - যা দুরন্ত তাকে শান্ত করাই বস্তুত কঠিন কাজ। শান্তকে শান্ত করা, স্থিরকে স্থির রাখা এত কোন ব্যাপারই নয়।

বুদ্ধ - বেশ, তা হলে এবার শোনো। দৃশ্য প্রাণী-জগতের প্রতিটি প্রাণীর অস্তিত্ব দুটো বিরোধী, তবে পরস্পরাশ্রিত, তত্ত্ব দিয়ে গঠিত। এ দুয়ের নাম 'নাম' ও 'রূপ'। নামের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা ও ওজন নেই। আকার নেই। বর্ণ নেই। ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। তা এক অস্পৃশ্য ও অদৃশ্য ক্রিয়াশীল তত্ত্ব। সে নিজে অস্পৃশ্য হলেও একে অস্পৃশ্য রেখে কোন কাজই সম্ভব নয়। 'চণ্ডীপাঠ হতে জুতো সেলাই করা'র ন্যায় জন্ম হতে মৃত্যু সবই এর কাজ। সব ধর্ম সব কর্মের এ (নাম)ই পূর্বগামী। আর এর মূল কাজ। এ কারণে একে সাধারণত

মন বলা হয়। এর অন্য অনেক নাম রয়েছে যেমন চিত্ত, চেতস, মানস, বিজ্ঞান ইত্যাদি। গতি এর দুরন্ত। বিদ্যুৎ-গতিও এর কাছে হার মানে। বড়ই চপল। বড়ই চঞ্চল। তা সদা স্পন্দনশীল। রঙ্গ নেই, রূপ নেই, তবুও তা বহুরূপী। পরিস্থিতি অনুসারে পলে পলে তা বদলায়।

উপক - তাহলে, মানুষ যে হাঁসে, কাঁদে, দৌড়-ধাপ করে, কখনও উঠে, কখন বসে, কখন শোয়, কখন জাগে, তা কি মিথ্যা? মনকে তো হাসতে কাঁদতে দেখি না, উঠতে বসতেও দেখি না।

বুদ্ধ - মন অস্পৃশ্য। অদৃশ্য। শরীর ও শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মনের আজ্ঞাবাহক। পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুসারে মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। প্রতিক্রিয়ায় মনের পরিবর্তন হয়। মনের পরিবর্তনে শরীরেও অনুকূল-প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। প্রতিক্রিয়া অনুসারে শরীর ও শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নানা রূপ ও মুদ্রা পরিলক্ষিত হয়। লৌকিক জগতে মানুষের শরীরের এক এক মুদ্রার পরিচিতি ভিন্ন ভিন্ন শব্দে মেলে।

উপক - 'নামে'র সাথে যে 'রূপে'র কথা বলছিলেন সে 'রূপ' কি? সেটা তো বললেন না।

বুদ্ধ - হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলছি। মানুষ বা প্রাণীর অস্তিত্বে মন বা নাম ব্যতীত আর শেষ যা থাকে তাকে শরীর বলে। এই শরীরের আকার, প্রকার রয়েছে। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা ও ওজনে একে মাপা যায়। কর্ম, চিত্ত, ঋতু, আর আহারের পরিবর্তনে শরীরের আকার-প্রকার, রঙ্গ-রূপ পরিবর্তিত হয়। এটাই শরীরের মূল লক্ষণ। এ জন্যে শরীরকে 'রূপ'ও বলা হয়। সাধারণত দেহ, কায়, রূপায়তন, কায়ায়তন আদি শব্দও 'রূপ' বা 'শরীরে'র স্থলে প্রয়োগ করা হয়।

উপক - শাস্তা, আপনি তো বললেন 'নাম' বা মনের অনেক কাজ। এই মন মানুষকে কখনও হাসায়, কখনও কাঁদায়, কখনও ওঠায়, কখনও বসায়, কখনও শোয়ায়, কখনও দাঁড় করায়, আরও কত কি করায়? তবে কি মন অনেক, না এক?

বুদ্ধ - প্রশ্ন সরল হলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মন বহুরূপী। এক হয়েও তা অনেক। একে অনেকে এক বলে জানে। আর অনেকে অনেক বলে জানে। প্রথমে এর বহুরূপতাকে জানা যাক। আর মন যদি এক হত, আর অপরিবর্তনশীল থাকত তবে যে মন দিয়ে মানুষ হাসছে, সে মনে সে চিরকাল হেসেই চলতো। যে মন দিয়ে মানুষ একবার কাঁদে, সে মন দিয়ে সে চিরকাল কেঁদেই চলতো। কিন্তু তা তো হয় না। কেন হয় না এমন? কারণ মন এক নয়। অনেক। তবে এর পরম বিশুদ্ধরূপটি এক। এবার বল, উপক, এমন মন ধরা ও করায়ত্ত করা সহজ কাজ, না নানান মুদ্রায় শরীর আঁকানো-বাঁকানো সহজ?

উপক - এবার বুঝলাম শারীরিক ব্যায়ামের তুলনায় মানসিক ব্যায়াম অনেক কষ্টকর এবং দুঃসাধ্য ব্যাপার। আপনারা কি শারীরিক ও মানসিক উভয় ব্যায়ামই করেন?

বুদ্ধ - হ্যাঁ, আমরা দুটোই করি। তবে জন-সমাজে যে শারীরিক ব্যায়ামের প্রচলন রয়েছে আমরা সে সব শারীরিক ব্যায়াম করি না।

উপক - আপনাদের শারীরিক ব্যায়াম ও জন-সমাজে প্রচলিত শারীরিক ব্যায়ামের পার্থক্য কিসে?

বুদ্ধ - জন-সমাজে প্রচলিত শারীরিক ব্যায়ামে শরীর সুস্থ, সুন্দর, সবল ও কর্মক্ষম হয়। এর সাথে মেধা শক্তি ও মনের কর্মক্ষমতাও সামান্যভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মানসিক জগতের পূর্ণ বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন এতে সম্ভব হয় না। কারণ এতে মানসিক ব্যায়াম হলেও তা

শরীর-কেন্দ্রিক। জন-সমাজে প্রচলিত ব্যায়াম অনুশীলনকারীর ধারণা শরীর সবল, সুন্দর ও সুস্থ হলেই মন সবল, সুন্দর ও সুস্থ হয়। কারণ এদের মতে মনের মূল উৎস শরীর।

উপক - এ ব্যাপারে আপনি কোন্ মত পোষণ করেন?

বুদ্ধ - আমাদের কর্মবাদ ও জন্মবাদ অনুসারে এ সংসারে যা যত সূক্ষ্ম তা ততই শক্তিশালী। স্থূল শরীর অপেক্ষা মন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। স্থূল কোন দিনই সূক্ষ্মের স্রোত হতে পারে না। সূক্ষ্মই সব সময় স্থূলের উৎস হয়। আমাদের মতে মন শরীরের (রূপ) উৎপত্তির মূল কারণ। মন সদা সর্বাগ্রগামী। শরীর তার অনুগামী আজ্ঞাবাহক মাত্র।

উপক - তবে আপনারা শারীরিক ব্যায়াম করেন কেন? না করলেই হয়।

বুদ্ধ - শারীরিক শক্তি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আমরা শারীরিক ব্যায়াম করি না। আমাদের মূল উদ্দেশ্য মানসিক জগতের বিকাশ ও এর উৎকর্ষ সাধন। শারীরিক সুস্থতা ও অসুস্থতার উপর মানসিক জগতের বিকাশ অনেকটা র্নিভরশীল। তবে তা পূর্ণত নহে। কারণ শারীরিক দুর্বলতা, অক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে মানুষ তার মানসিক জগতের পরিপূর্ণ উৎকর্ষ সাধন করতে পারে এবং অন্যেরও সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সহায়ক হতে পারে এমন প্রমাণ আমাদের ভূরি ভূরি রয়েছে। আবার শারীরিকভাবে সবল, সুস্থ ও কর্মক্ষম হওয়া সত্ত্বেও মানুষ মানসিক বিকার-গ্রস্ত হয়ে দুঃসহ অথর্ব জীবন বা হীন জীবন যাপন করছে- এমন প্রমাণও সমাজে বিরল নহে। এই দুই তথ্য হতে এটাই সহজে অনুমেয় যে মন ও শরীর দুই পরস্পর নির্ভরশীল হলেও শরীরের উপর মনের প্রভাব অধিকতর বলশালী। আমরা শারীরিক ব্যায়াম-অনুশীলনের মাধ্যমে মানসিক ব্যায়াম না করে মানসিক

ব্যায়ামের মাধ্যমে শারীরিক ব্যায়াম করে থাকি। শারীরিক শক্তি সঞ্চয় ও সৌন্দর্য সাধন পরম ও চরম লক্ষ্য না হলেও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের আবশ্যিক অঙ্গ হিসেবে মানসিক ব্যায়াম অনুশীলনকারীগণ সেই শারীরিক শ্রীসম্পত্তিরও অধিকারী হন।

উপক - এক কাজে দুটো ফল। তাও আবার একই সাথে। এতো অতি উত্তম-কথা যা লুফে নিতে হয়। তা আপনার সম্যক্ ব্যায়ামে ব্যায়াম-অনুশীলনকারীকে কোন্ ব্যায়াম করতে হয়?

বুদ্ধ - পূর্বেই বলেছি আমাদের সম্যক্ ব্যায়াম হচ্ছে একপ্রকারের মানসিক ব্যায়াম। এ ব্যায়াম জানার আগে মানব-মনের চরিত্র ও ক্রিয়া সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া অত্যাবশ্যক। মানব-মনটি উদ্ভিদের মূলময় অদৃশ্য জগতের তুলনীয়। উদ্ভিদ্ বলতে সাধারণত মাটির উপরের ফল, ফুল, শাখা-প্রশাখা, পত্র ও কাণ্ডময় অংশকেই বোঝা হয়। কিন্তু মূলত মাটির নীচের মূলময় অংশ নিয়েই হয় একটি পরিপূর্ণ উদ্ভিদ। এভাবে মানবেরও অন্তর ও বাহির দুটো জগত রয়েছে। এ দুটোর মধ্যে মানবের অন্তর-জগতকেই বলা হয় মন। মানব-মনের এই অদৃশ্য অন্তর-জগত তার বহির্জগত অপেক্ষা অনেক বিশাল। এই বিশাল অন্তরজগতের দুটো স্তর রয়েছে। একটি সুপ্ত, আরেকটি ক্রিয়াশীল। নৈতিকতার দৃষ্টিতেও এই অন্তর-জগত দুভাগে বিভক্ত - কুশল (পুণ্যময়) ও অকুশল (পাপময়)। এভাবে সুপ্ত ও ক্রিয়াশীল দুই অন্তর-জগতও কুশল-অকুশলভেদে বিভক্ত। অন্তর-জগতের মানসিক স্থিতি প্রতি পল বদলায়। কখনও কুশল আর কখনও অকুশল। আবার কখনও কুশলের পর কুশল মানসিক স্থিতির উৎপত্তি হয়ে থাকে। আবার কখনও অকুশলের পর অকুশল মানসিক স্থিতির উৎপত্তিতে একটানা অকুশল মানসিক স্থিতি বর্তমান থাকে। কুশল ও অকুশল এরা পরস্পরের বিরোধী মানসিক প্রবৃত্তি। একের উৎপত্তিতে

আরেকটি অনুৎপন্ন অবস্থায় থাকে। যেভাবে বাষ্পের উর্দ্ধাকাশে গমন এবং ভারী পদার্থের নিম্ন-পতন অনায়াসে হয় ঠিক সেভাবে অনুৎপন্ন অকুশল মানসিক প্রবৃত্তির উৎপত্তি ও উৎপন্ন অকুশল মানসিক প্রবৃত্তির উৎপত্তি ও নিরন্তর বৃদ্ধিও অনায়াসে হয়। তবে তা দুঃখজনক ও দুঃখবর্দ্ধক। দুঃখের হ্রাস ও পূর্ণ দুঃখমুক্তির জন্যে অনুৎপন্ন কুশল মানসিক প্রবৃত্তির উৎপত্তি এবং উৎপন্ন কুশল মানসিক প্রবৃত্তির নিরন্তর বৃদ্ধির প্রয়োজন। তবে তা অনায়াসে হয় না। প্রয়াসে হয়। এই প্রয়াসকে বলা হয় সম্যক্ ব্যায়াম।

উপক - সাংঘাতিক ব্যাপার। এমন ব্যায়ামের কথা তো কোনদিন কারও মুখে শুনি নি। কখন করতে হয়? সকালে না সন্ধ্যায়? কোন্ ক্ষণে কোন্ মূহূর্ত্তে এ ব্যায়াম অধিক সুফল-দায়ক?

বুদ্ধ - তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম অকালিক ধর্ম। ধর্ম-অনুশীলনের অর্থাৎ আমাদের সম্যক্ ব্যায়ামের কোন কালাকাল নেই। অর্থাৎ নিরন্তর পালন ও প্রয়াসের ধর্ম। দিনের ও জীবনের যে কোন মূহূর্তে এই সম্যক্ ব্যায়ামের সুফল প্রাপ্ত হয়। একে সান্দৃষ্টিক-ধর্মও বলা হয়। অনাগত জীবনে নয়, ইহ জীবনে, আজ এবং এখনই এ কর্ম-সম্পাদনের পরিণাম সাথে সাথে প্রতি পলে ঘটে।

উপক - তাহলে এখন থেকেই এ ব্যায়াম শুরু করে দিই? কেমন?

বুদ্ধ - সম্যক্ ব্যায়াম শুরু করার পূর্বে সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি সম্পর্কেও তোমাকে ওয়াকিবহাল হতে হবে। তা না হলে মধ্যম মার্গের অঙ্গ-হানি হবে। অষ্টাঙ্গিক মার্গের একটি অঙ্গও যদি অপূর্ণ থাকে তবে তা মধ্যম মার্গ হবে না। অপূর্ণ অঙ্গে শতই ব্যায়াম কর না কেন, তাতে তুমি আশানুরূপ ফল পাবে না।

উপক - এবার বলুন 'সম্যক্ স্মৃতি' কি?

বুদ্ধ - 'সম্যক্ স্মৃতি'তে 'সম্যক্' ও 'স্মৃতি' দুটো শব্দ রয়েছে। সম্যক্ শব্দের প্রয়োগ অনেকবার করেছি। আশা করি তাতে এর অর্থ স্পষ্ট হয়েছে। নতুন যে শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে, সেটি হল 'স্মৃতি'। সাধারণত বিস্মৃত অতীত ঘটনা স্মরণের মানসিক প্রক্রিয়াকে 'স্মৃতি' বলে বোঝা হয়। কিন্তু আমাদের এখানে এ শব্দটি এক ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়।

উপক - তাই না কি? সে ভিন্ন অর্থ-টি কি তা হলে?

বুদ্ধ - মানুষের ক্ষণ-ভঙ্গুরময় জীবন এক ত্রৈকালিক প্রবাহ মাত্র। এই ত্রৈকালিক প্রবাহের অস্তিত্ব মনের মননশীলতার উপর নির্ভরশীল। মননশীলতার জন্যে মনের প্রয়োজন হয় আলম্বন বা বিষয়ের। মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে জানা গেছে মনের এই চিন্তনীয় বিষয় কালভেদে তিন প্রকার। মন হয়ত বিস্মৃত বা স্মরণীয় অতীত ঘটনার রোমন্থনে মগ্ন থাকে, না হয় বর্তমানের অনুভূত বিষয়ে চিন্তা করে, আর না হয় তার ভাবী অস্তিত্বের পরিকল্পনায় লীন থাকে। আরো সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে জানা যায় মন সাধারণত অতীতের স্মৃতিচারণে বা ভাবী অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় পরিকল্পনায় অধিককাল প্রমত্ত থাকে। এভাবে এ দুয়ের চিন্তায় মানুষ তার হস্তাগত দুর্লভ ও অমূল্য বর্তমান কাল, ক্ষণ ও জন্ম সবই নিরর্থক-ভাবে ব্যয় করে। মানবের উচিত ক্ষণে ক্ষণে ক্ষয়ে যাওয়া এই বর্তমান ক্ষণ, কাল ও জন্মের সর্বাধিক সদ্ব্যবহার করা। দুর্লভ মানব-জীবন সার্থক করতে হলে প্রয়োজন 'স্মৃতি'র পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা জানা।

উপক - প্রভু, আপনার আলোচ্য বিষয়গুলি নতুন। নতুন হলেও দেশনা-শৈলী সরল হওয়ায় বুঝতে মোটেই কষ্ট হচ্ছে না। অনুরোধ এ সরল শৈলীতেই আমাকে বোঝাবেন।

বুদ্ধ - মনের সহভূ, সহগামী, সহক্রিয়াশীল ও সহবিনাশশীল, মানসিক প্রবৃত্তিকে (ধর্ম) চৈতসিক' বলা হয়। 'চৈতসিক' সর্বমোট বাহান্ন প্রকার। এরা সর্বসাধারণ চৈতসিক, প্রকীর্ণক চৈতসিক, অকুশল চৈতসিক ও শোভন চৈতসিক ভেদে মোটামুটি চার প্রকার।

'সর্ব সাধারণ চৈতসিক', 'প্রকীর্ণক চৈতসিক' ও 'অকুশল চৈতসিক' যুক্ত চিত্তকে 'অকুশল চিত্ত' বলা হয়। 'অকুশল চিত্তে' প্রভাবিত হয়ে যে 'কর্ম' সম্পাদিত হয় তা অকুশল (পাপ) কর্ম।

'সর্ব সাধারণ চৈতসিক', 'প্রকীর্ণক চৈতসিক' ও 'কুশল চৈতসিক' যুক্ত চিত্তকে 'কুশল চিত্ত' বলা হয়। কুশল চিত্তে প্রভাবিত হয়ে যে কর্ম সম্পাদিত হয় তা 'কুশল কর্ম'।

'কুশল (বা শোভন) চৈতসিক' সর্বমোট পঁচিশ প্রকার। এদের মধ্যে 'স্মৃতি' একটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ চৈতসিক।

উপক - 'স্মৃতি'র পরিচয় পেলাম। কিন্তু এর অর্থ কি তা তো বললেন না।

বুদ্ধ - 'স্মৃতি'র অর্থ জাগ্রতভাব, সতর্কতা, অপ্রমত্ততা আদি।

উপক - এর কাজ?

বুদ্ধ - 'স্মৃতি' দুয়ার-রক্ষীর (প্রহরী) কাজ করে। গৃহাভ্যন্তরে আগন্তুক প্রতিটি ব্যক্তির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং এদের কে হিতকারী, আর কে অহিতকারী তার সত্য-অসত্যতা যাচাই করে গৃহস্বামীকে জানিয়ে সচেতন করা এবং তার সুরক্ষা প্রদান করা স্মৃতির (প্রহরী) কর্তব্য।

উপক - 'স্মৃতি'ও কি এসব কাজ করে? আশ্চর্যের ব্যাপার।

বুদ্ধ - আশ্চর্যেরই বিষয় বটে। 'স্মৃতি' এত সব করে। ইন্দ্রিয় ও

ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শে মানস-জগতে উৎপন্ন মানসিক প্রবৃত্তির কোন্‌টি কুশল, কোন্‌টি অকুশল, কোন্‌টি হিতকারী আর কোন্‌টি অহিতকারী, তাদের উৎপত্তিক্ষণেই মনকে সজাগ রাখাই 'স্মৃতি'র কাজ। এভাবে সজাগ রাখার মাধ্যমে 'স্মৃতি' 'কুশল চিত্তের' সুরক্ষা প্রদানে সহায়ক হয়। 'স্মৃতি' যে শুধু সুরক্ষা প্রদান করে তা নয়, এর কাজ বহুমুখী। একে সবার্থ সাধকও বলা হয়।

উপক - তা কেন?

বুদ্ধ - প্রত্যেক কর্ম-সম্পাদনে 'স্মৃতি'র উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক। 'স্মৃতি'র অভাবে কর্মের সুচারু সম্পাদন তো অনেক দুরের কথা। কর্ম-সম্পাদনের প্রারম্ভেই দুর্ঘটনা ঘটে। এ সংসারে ছোট থেকে বড় যে সব মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে সে সবের অধিকাংশেরই কারণ বিশ্লেষণে দেখা যায়- 'স্মৃতি'র অনুপস্থিতিই মূল কারণ। নির্ভূল ও সুচারু কর্ম-সম্পাদনে 'স্মৃতি'র ভূমিকা অনস্বীকার্য নয়।

উপক - 'স্মৃতি' কি তবে ভৌতিক উন্নতি সাধনে হিতকারী?

বুদ্ধ - হ্যাঁ। ভৌতিক উন্নতি প্রদানেও 'স্মৃতি' প্রধান সহকারী মানসিক প্রবৃত্তির ভূমিকা পালন করে। ভৌতিক উন্নতি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে উন্নতমানের জীবিকার প্রয়োজন। উন্নতমানের জীবিকার জন্য প্রয়োজন হয় শিল্পে, বিদ্যাভ্যাসে, গবেষণায় নিপুণতা প্রাপ্তি। আর কোন বিষয়ে নিপুণতা অর্জনে শিক্ষার্থীকে যে সব প্রাথমিক গুণের অধিকারী হতে হয় তাদের একটি হল 'স্মৃতি'।

উপক - ভৌতিক উন্নতি ব্যতীত এমন আর কোন্ উন্নতি সাধিত হয় যাতে 'স্মৃতি'কে সর্বার্থসাধক বলা যেতে পারে?

বুদ্ধ - মানবের উন্নতি দু-ধরণের ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক। ভৌতিক

তত্ত্ব স্থূল ও অস্থায়ী হওয়ায়, ভৌতিক সুখও স্থূল ও অস্থায়ী। আধ্যাত্মিক উন্নতি কেবল মানসিক জগতে সম্ভব হয়। মানসিক জগত সূক্ষ্ম হওয়ায় আধ্যাত্মিক সুখ মাত্রায় ভৌতিক সুখাপেক্ষা অধিকতর ও মানে অধিকতর সূক্ষ্মতর হয়। ক্ষণিক ও লৌকিক সুখ-স্তর পেরিয়ে সাধক ক্রমান্বয়ে তার আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হয়। আধ্যাত্মিক উন্নতির এই চরম শিখরে একবার উন্নীত হলেই হয়। চাওয়া পাওয়ার সব স্বাদ সাধকের চিরতরে মিটে যায়। উন্নতির এই চরম (শিখড়ে) চূড়োয় উন্নীত হতেও সাধককে 'স্মৃতি'র সিঁড়ি বেয়ে চলতে হয়। এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ কারণে স্মৃতি সর্বার্থ সাধক।

উপক - এমন সর্বার্থ-সাধক 'স্মৃতি'কে কে না পেতে চাইবে? এই 'স্মৃতি'-শক্তি বৃদ্ধির উপায় কি?

বুদ্ধ - উপক! সতের প্রকারে 'স্মৃতি'র উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়।

উপক- ঐ সতের প্রকার কি কি?

বুদ্ধ - 'স্মৃতি'-শক্তির উৎপত্তি ও বৃদ্ধি অভিজ্ঞা, কৌশল, স্থূল বিজ্ঞান, হিত বিজ্ঞান, অহিত বিজ্ঞান, সদৃশ নিমিত্ত, বিসদৃশ নিমিত্ত, কথাভিজ্ঞা, লক্ষণ, স্মরণ করান, মুদ্রা, গণনা, ধারণ, ভাবনা, গ্রন্থ নিবন্ধন, উপনিক্ষেপ এবং অনুভূতি আদি সতের প্রকারে সম্ভব।

উপক - 'স্মৃতি'রও কি কোন প্রকার-ভেদ রয়েছে, না সব স্মৃতিই একপ্রকারের?

বুদ্ধ - 'স্মৃতি'র প্রকার-ভেদ রয়েছে। তবে মোটামুটি দু-প্রকার। সম্যক্ স্মৃতি ও মিথ্যা স্মৃতি।

উপক - 'সম্যক্ স্মৃতি' আর 'মিথ্যা স্মৃতি'- এ আবার কেমন ব্যাপার?

বুদ্ধ - যে 'স্মৃতি'-সাধনায় ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দুইয়েরই উন্নতি

সাধিত হয় তা 'সম্যক্ স্মৃতি'। আর যে 'স্মৃতি'-সাধনায় কেবল ভৌতিক উন্নতি সাধিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে কর্ম-কর্তার অহিত সাধিত হয় তা 'মিথ্যা স্মৃতি'।

উপক - ভৌতিক সুখে আমার প্রয়োজন নেই। আধ্যাত্মিক সুখের সন্ধানে আপনার নিকট এসেছি। অতএব সম্যক্ স্মৃতি-সাধনার উপায় আমায় বলুন।

বুদ্ধ - 'সম্যক্ স্মৃতি'-সাধনার উপায় চার। কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন ও ধর্মানুদর্শন।

উপক - প্রভু অনন্তজিন। এ শব্দগুলো দেখছি বড়ই জটিল।

বুদ্ধ - অজানা সবই জটিল, রহস্যজনক ও সমস্যাময় মনে হয়। জানলে সবই সরল, ও সমস্যামুক্ত মনে হবে। বেশ তোমাকে আরও একটু সোজাভাবে বুঝিয়ে বলি।

উপক - বড়ই অনুকম্পা হবে, ভগবান।

বুদ্ধ - দেখ, উপক। আমাদের ধর্ম হচ্ছে বিভজ্যবাদী ধর্ম। অস্তিত্ববান প্রতিটি বস্তু ও ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সত্য উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে এদের নানাভাবে নানাদৃষ্টিতে দেখা হয়। বিশ্লেষণ-অনুবিশ্লেষণের পর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। এ সবের অন্তর্নিহিত বিভাজ্য ও অবিভাজ্য স্থিতিকে সত্য বলে গ্রহণ করা হয়। এখানে কল্পনাশ্রিত সত্যের স্থান নেই।

উপক - গৃহী জীবনে জীবিকার্জনের কাজে মৃত জীব-জন্তুর মাংস অনেক কেটেছি। মাংস টুকরো করার কাজে আমি অভ্যস্ত। ওতে তো কোনদিন কোন সত্য উদ্ঘাটিত হয় নি। মাংস টুকরো করেছি বটে অনেক, তবে জীব-হত্যা করি নি। জীবন্ত প্রাণী-হত্যা, নর-হত্যা করে

ওসবের কাট-চির করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হত্যা করা ছাড়া কি সত্য জানা যায় না?

বুদ্ধ - তোমাকে কি আমি কখনও প্রাণী-হত্যা বা নর-হত্যা করার কথা বলেছি?

উপক - কেন? এই যে এই মাত্র অস্তিত্ববান প্রাণী বা ব্যক্তির বিশ্লেষণ বা অনুবিশ্লেষণের কথা বললেন? হত্যা ছাড়াও কি বিশ্লেষণ-অনুবিশ্লেষণ সম্ভব? নাকি আত্ম-হত্যা করার সংকেত দিলেন?

বুদ্ধ - কেবল দেহের মাংস কাট-চির করার মধ্যেই যদি সৃষ্টি ও বিনাশের রহস্য-উদ্‌ঘাটনের সম্ভাবনা থাকতো তবে শল্য-চিকিৎসক ও মাংস-বিক্রেতারা সবাই সত্য-জ্ঞাতা হয়ে যেতেন। অনুরূপভাবে প্রাণীহত্যায় (মাত্রেই) যদি 'সত্য' উদ্ঘাটনের সম্ভাবনা থাকতো, তবে গো-ঘাতক, নর-ঘাতক আদি হত্যাকারী ও ঘাতকেরাও সবাই পরম সুখ, শান্তি ও সত্যের জ্ঞাতা হয়ে পড়তেন। কেবল শল্য-চিকিৎসা ও অস্ত্র-ঘাত জনিত কর্মের মাধ্যমে কেহ কোনদিন 'সত্য'-জ্ঞাতা হয়েছেন এমন ঘটনার নজির আমাদের জানা নেই। তা অসম্ভব। আদি অকল্যাণকর কর্মের মধ্য এবং অন্তও অকল্যাণকর হয়। এর বিপরীত আদি কল্যাণকর কর্মের মধ্য এবং অন্তও কল্যাণকর হয়। এটিই স্বাভাবিক ও সনাতন নীতি। যা সত্য তাই শিব, আর যা শিব তাই শুভ। শিব, শুভ ও সত্যের সন্ধানের শুরু সব সময় শুভতেই সন্নিহিত থাকে। অস্তিত্বের বিশ্লেষণ-অনুবিশ্লেষণে শল্য-চিকিৎসা বা অস্ত্রাঘাত-জনিত দেহ-বিশ্লেষণে শল্য-চিকিৎসা বা অস্ত্রাঘাত-জনিত দেহ-বিশ্লেষণ বোঝায় না। রসায়নিকগণ প্রাণী বা পদার্থের কোন এক বিশেষ অংশের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-অনুবিশ্লেষণ করেন। আমরাও অনুরূপভাবে প্রাণীর অস্তিত্বের সংঘটক 'নাম' ও 'রূপে'র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম

মানসিক বিশ্লেষণ করি। শীল-সমাধি-জাত প্রজ্ঞা-দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। তাতে প্রজ্ঞালোকে উদ্ভাসিত তত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্টি ও বিনাশের মূল কারণ অনুসন্ধান করি। সমস্ত অস্তিত্ববান প্রাণীর বা পদার্থের অন্তর্নিহিত ও প্রজ্ঞালোকে উদ্ভাসিত অখণ্ডনীয় সত্যের রহস্যোদ্ঘাটন করি।

উপক - শুনেছি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ জানার জন্যে ঘর- পরিবার ত্যাগ করে মানুষ ঋষি-মুনির সাজে দেশ-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে দেশ-ভ্রমণকেও জ্ঞান-সঞ্চয়ের স্রোত হিসেবে গণ্য করা হয়। আপনি কি তা স্বীকার করেন না?

বুদ্ধ - উপক! প্রশ্ন তোমার ছোট। তবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই এর উত্তর কিন্তু বিশাল। সংক্ষিপ্ত উত্তরে জিজ্ঞাস্য বিষয় স্পষ্ট হবে না। কাজেই তোমার প্রশ্নের উত্তর একটু বিশদাকারেই দেব। কেমন?

উপক - সংক্ষিপ্ত হউক বা বিস্তৃত, মর্ম-উদ্ধারেই কাজ।

বুদ্ধ - বেশ, তাহলে শোন। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক ভেদে জ্ঞান দু প্রকার। অক্ষরজ্ঞান হতে আরম্ভ করে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ জানার জ্ঞান অবধি জাগতিক জ্ঞানের পরিধি।

উপক - আর আধ্যাত্মিক জ্ঞান?

বুদ্ধ - ভৌতিক জ্ঞান-দানের সাথে যা প্রাণীর অর্থাৎ নিজের আন্তরিক জগতের পূর্ণ পরিচয় প্রদানে সমর্থ তা আধ্যাত্মিক জ্ঞান।

উপক - এই জগতকে ব্রহ্মাণ্ড বলা হয় কেন?

বুদ্ধ - তোমার কি ধারণা এ ব্যাপারে?

উপক - বাল্যকালে আচার্য-প্রাচার্যগণের নিকট শুনেছিলাম এবং পরে

বড় হয়ে নিজেও পড়েছি হিরণ্য নামে এক ব্রহ্ম প্রাগৈতিহাসিক কালে স্বর্ণ-বর্ণের এক ডিম পেড়েছিল সেই সোনার বরণের ডিম হতেই নাকি এই বিশ্বের (ভূ-গোলকের) সৃষ্টি। তাই ব্রহ্মাণ্ড।

বুদ্ধ- ব্রহ্মা কি তবে তোমাদের হাঁস-মুরগীর মতো ডিম পাড়েন? ব্রহ্মগণ দিব্য পুরুষ। এই সংসারের সব ব্রহ্মার জীবন-যাপন প্রণালী আমার নখাগ্রে। এখানে মনুষ্যেতর তির্য্যক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত স্থলচর, জলচর, উভচর, খেচর, পশুপক্ষী ও কিছু সরীসৃপ শ্রেণীর প্রাণীরই তাদের বংশবৃদ্ধির মানসে ডিম পাড়ে। ব্রহ্মগণের জীবনমান মনুষ্যাপেক্ষা অতি উন্নত। অতুলনীয়। তারা ডিম পাড়তে যাবেন কোন্ দুঃখে?

উপক - তবে কি এই জগতকে ব্রহ্মাণ্ড বলার কোন তর্ক-সঙ্গত কারণ নেই?

বুদ্ধ - কারণ নেই, তা নয়। কারণ আছে। তবে এ বিশ্বকে ব্রহ্মের অণ্ড-রূপে গ্রহণ করার ধারণা একেবারে হাস্যস্কর। তা বিবেকশীল মানুষের গ্রহনীয় নয়।

উপক - তবে তা হলে আপনিই বলুন, কি কারণ?

বুদ্ধ - 'ব্রহ্মাণ্ড'-শব্দের বিশ্লেষণ করলে কি পাওয়া যায়?

উপক - কেন? এতো সোজা। 'ব্রহ্ম' ও অণ্ড'-এ দুয়ের সংযোগে ব্রহ্মাণ্ড শব্দের সৃষ্টি।

বুদ্ধ - 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ?

উপক - পরম ব্রহ্ম।

বুদ্ধ - এর আর কোন অর্থ কি তোমার জানা আছে?

উপক - না।

বুদ্ধ - 'ব্রহ্ম' শব্দের প্রয়োগ বিভিন্ন অর্থে হয়। এদের মধ্যে এই দুটি সর্বাধিক প্রচলিত।

উপক - কি কি? কোন্ কোন্ অর্থে?

বুদ্ধ - রূপ-ব্রহ্মলোক ও অরূপ-ব্রহ্মলোকের নিবাসী দেবগণকে ব্রহ্ম বলা হয়। এখানে 'ব্রহ্ম' শব্দ এমন লোকের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে যেখানে কামলোকের দূষনীয় হীন তত্ত্ব মোটেই পরিলক্ষিত হয় না।

ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি শব্দে ব্রহ্ম-শব্দ 'শ্রেষ্ঠ আচরণ'-অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ব্রহ্মবিহার-শব্দে এটি হিংসা-বিদ্বেষ বিহীন এক নিরপেক্ষ, অসংকীর্ণ এবং অসীম মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষাময় শ্রেষ্ঠ মানসিক স্থিতির দ্যোতক।

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, আকারে-প্রকারে বিশালতম ব্যাপ্তি আবার যা অণুতম ক্ষুদ্র তাও ব্রহ্মরূপে সূচিত হয়। পদার্থ বা ব্যাপ্তি অর্থেও প্রাণীর গুণ-বিশেষের উল্লেখার্থেও 'ব্রহ্ম'-শব্দ প্রযুক্ত হয়। যেমন - ব্রহ্মজাল।

কখনও কখনও এটি ভীষণ, ভয়ানক, চরম, মারাত্মক, প্রচণ্ড, ভারী ইত্যাদি অর্থেরও সূচক। যেমন- ব্রহ্মদণ্ড।

আবার কোন কোন প্রসঙ্গে 'শুভ' অর্থ-সূচকও এটি। যেমন- ব্রাহ্মমূহূর্ত।

উপক - 'ব্রহ্ম'-শব্দের প্রয়োগ এত বিভিন্ন অর্থে হয় তা আমার জানা ছিল না। আপনার 'ব্রহ্ম'-শব্দার্থের বিশ্লেষণে মনে হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ড-শব্দের

প্রসঙ্গে এটি বিশ্বের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, আকার-প্রকারে বিশালতম হবার গুণ-বিশেষকে সংকেত করছে।

বুদ্ধ - হ্যাঁ, উপক! ঠিকই বুঝেছ। এই বিশ্ব আকারে-প্রকারে, দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে আর উচ্চতায় এত বিশাল যে এর বাইরে কিছুই নেই। সবই এর অন্তর্ভুক্ত। দেখতে তা অনেকটা ডিম্ব বা অণ্ডা গোলাকৃতির। এ অর্থে একে ব্রহ্মাণ্ড বলা হয়। এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এত বিশাল যে কেহ কোনদিন এর সম্পূর্ণ জ্ঞান-সঞ্চয় করতে পারে না। একবার নয়, অনন্তবার জন্ম নিয়েও কেহ এর স্বরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্বচক্ষে দর্শন করার প্রয়াস করলেও তা সে শেষ করতে পারে না। বিশ্ব-দর্শন তথা বিশ্ব-দর্শন-জনিত তৃপ্তির শেষ নেই। প্রতি জন্মে, প্রতি বছর, প্রতিমাস, প্রতিদিন এবং এমন কি প্রতি পল এর পরিবর্তন হচ্ছে। এ কারণে পরের মুখে বর্ণনা শুনেও এ বিশ্বের পরিপূর্ণ জ্ঞান-সঞ্চয় করা যায় না।

উপক - আত্ম-জ্ঞানে ব্যক্তির একার অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান হয়। আর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ জানা সম্বন্ধীয় অধ্যাত্ম জ্ঞানে সারা সংসারের জ্ঞান হয়। তুলনামূলকভাবে মনে হচ্ছে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অপেক্ষা জাগতিক জ্ঞানের পরিধি বিশাল। অবশ্য আমার ধারণা মিথ্যেও হতে পারে। আপনার কাছে এর সত্য-অসত্যতা যাচাই করে নিচ্ছি।

বুদ্ধ - প্রথমেই বলেছি সংসারের ভৌতিক স্বরূপ সম্বন্ধীয় আত্ম-জ্ঞান সব সময়ই অপূর্ণ। অথচ অধ্যাত্ম-জ্ঞান সদা-সর্বদা এক পরিপূর্ণ জ্ঞান। আধ্যাত্মিক জ্ঞান সঞ্চয়ের কোন কালাকাল নেই। যে কোন কালে তা লাভ করা যায়। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের স্রোত যদিও ব্যক্তিভিত্তিক, তথাপি এর মাধ্যমে ব্যক্তি অপরকেও ভাল-ভাবে জানতে পারে। এই জ্ঞানে ব্যক্তি 'নাম' ও 'রূপ' (অর্থাৎ মন ও শরীর) দুটিরই বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান সঞ্চয় করে। ব্যক্তির বহির্জগত অপেক্ষা

আন্তরিক জগত বিশালতর হওয়ায় অধ্যাত্ম-জ্ঞানের পরিধি জাগতিক-জ্ঞান অপেক্ষা বিশালতর। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রখরতায় সাধকের অন্তর্জগতে দিব্যদৃষ্টির সৃষ্টি হয়। সাধক বিশ্বের দেশ-সমূহের ভ্রমণ না করেও সে দিব্য-দৃষ্টি প্রয়োগের মাধ্যমে বিশ্ব-ভ্রমণের জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারে।

উপক - অন্তর্দর্শনে বিশ্বদর্শন হলে বিশ্ব-ভ্রমণের প্রয়োজন কিসের?

বুদ্ধ - বিশ্ব-ভ্রমণ একেবারে নিষ্প্রয়োজন তা নয়। ভ্রমণে ভৌতিক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান বাড়ে। সাথে দৈনন্দিন অপ্রত্যাশিত সাংসারিক সমস্যার সম্মুখীন হবার সাহসও সঞ্চিত হয়। সহনশীলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উদারতা বাড়ে। তবে চিত্ত চঞ্চল হয়। চঞ্চল চিত্ত পরমার্থ সত্য বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান সঞ্চয়ে বাধক হয়। কেবল অস্থি, কঙ্কাল, মাংস, চর্মাদির বিভাজনে সত্য-উদ্ঘাটিত হয় না। এতে প্রয়োজন সত্য-সন্ধানীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার। এই সত্য-সন্ধানী জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত আমাদের প্রজ্ঞাবান সাধক-সাধিকা-গণ বিশ্লেষণ-অনুবিশ্লেষণের মাধ্যমে কখনও নাম-রূপ, কখনও পঞ্চ-স্কন্ধ, কখনও দ্বাদস আয়তন, আর কখনও আঠার-ধাতু, কখনও বা বাইশ ইন্দ্রিয় ভেদে তাদের নিজ অস্তিত্বকে নানা রূপে-দর্শন করেন। এসবের মধ্যে মানব-অস্তিত্বের পঞ্চস্কন্ধ-বিভাজন পদ্ধতি অতি প্রসিদ্ধ।

উপক - পঞ্চস্কন্ধ কি?

বুদ্ধ - পঞ্চস্কন্ধ বলতে রূপ-স্কন্ধ, বেদনা-স্কন্ধ, সংজ্ঞা-স্কন্ধ, সংস্কার-স্কন্ধ ও বিজ্ঞান-স্কন্ধকে বোঝায়।

উপক - রূপ-স্কন্ধ বলতে কি বোঝায়?

বুদ্ধ - রূপ-শব্দের অর্থ নিশ্চয় বুঝেছ? 'স্কন্ধ-শব্দে'র অর্থ রাশি, সমূহ, পুঞ্জ, জট আদি। ভৌতিক তত্ত্ব-সমূহের সামূহিক নাম 'রূপস্কন্ধ'।

উপক - প্রভু! এ শব্দের অর্থ আর একটু বিশদাকারে বললে বুঝতে সুবিধে হবে।

বুদ্ধ - রাজ-প্রাসাদের সুরক্ষায় এর বাইরে ইট, পাথর, চুন, সুরকি আদির সম্মিশ্রণে কয়েকটি প্রাকার তৈরী করা হয়। অনুরূপভাবে প্রাণীর মন-জগতের বহিরাবরণ হচ্ছে শরীর। রক্তমাংসের এ শরীর একাধিক স্থূল ও সূক্ষ্ম তত্ত্বে (রূপ) তৈরী। এ সবের সব কটিই পরিবর্তনশীল বর্ণ ও আকার সম্পন্ন। তাই এ সব তত্ত্বসমূহকে সামূহিক ভাবে অর্থাৎ এক কথায় 'রূপস্কন্ধ' বলা হয়।

উপক - বেদনা-স্কন্ধ কি?

বুদ্ধ - রূপ-আবরণের পর প্রাণীর অস্তিত্বে বেদনাময় এক অদৃশ্য জগত (আবরণ) রয়েছে। বেদনা অর্থাৎ অনুভূতি। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শে বা সংঘর্ষে অনুভূতির সৃষ্টি হয়। এই অনুভূতি যে কেবল বর্তমানে বিদ্যমান তা নয়। অতীতেও ছিল। আর ভবিষ্যতেও থাকবে। অতীত হতে বর্তমান; বর্তমান হতে ভবিষ্যতের প্রতি অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবহমান ও পরিবর্তনশীল অনুভূতিতে তৈরী এই অদৃশ্য জগত। বিভিন্ন ধরণের অনুভূতির কোনটিকে বিশেষভাবে অবহেলনা বা উল্লেখ না করে ত্রৈকালিক অনুভূতিময় জগতের এক সামূহিক নাম বেদনা-স্কন্ধ রাখা হয়েছে।

উপক - তা হলে কি এই বেদনা-স্কন্ধকে তার অস্তিত্বের অন্তর্জগতের দ্বিতীয় আবরণ বলা যেতে পারে?

বুদ্ধ- অস্তিত্বের গঠন-প্রণালী বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে বেদনা-স্কন্ধকে

রূপ-আবরণের পরবর্তী দ্বিতীয় আবরণরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে কেহ যদি এই বেদনা-স্কন্ধের স্বরূপ চর্মচক্ষে দেখার উদ্দেশ্যে চর্ম, মাংস, অস্থি, কঙ্কাল কাটে, তবে তা দেখা যাবে না

উপক - সংজ্ঞা-স্কন্ধ কি?

বুদ্ধ - ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শে বা সংঘর্ষে অনুভূতি হয়। অনুভূতি-মাত্রেই মানসিক প্রতিক্রিয়া শেষ হয়ে যায় না। এর পরবর্তী স্তরে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অনুভূত বিষয়ের নামকরণ হয়। এটা 'ক', ওটা 'খ', ঐটা 'গ' ইত্যাদি। অথবা এটা 'লাল', ওটা 'কালো', ঐটা 'সবুজ' আদিতে চিহ্নিত করে পূর্ব ও বর্তমানের অনুরূপ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-বিষয়ের তুলনা করার উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও অনুভূত আলম্বনের 'সংজ্ঞা' প্রদান করা হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-বিষয় অনেক। অতএব অনুভূত বিষয়ের সংজ্ঞীকরণের প্রক্রিয়া ও মানসিক-স্থিতিও অনেক। সংজ্ঞীকরণের অনেক মানসিক স্থিতির কোনটিকে কম বা বেশী উপেক্ষা না করে অথবা কোনটিকে কম বা বেশী গুরুত্ব না দিয়ে সংজ্ঞীকরণের ত্রৈকালিক পরিবর্তনশীল মানসিক স্থিতিকে সামূহিক-ভাবে 'সংজ্ঞা-স্কন্ধ' বলা হয়।

উপক - 'সংজ্ঞা-স্কন্ধ' কি তা হলে অস্তিত্বের তৃতীয় আভ্যন্তরীণ আবরণরূপে ক্রিয়া করে?

বুদ্ধ - হ্যাঁ, একে তৃতীয় ক্রিয়া-শীল আবরণরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে এ স্কন্ধও বেদনা-স্কন্ধের ন্যায় চর্মচক্ষে দৃশ্য নয়। কেবল মানস-চক্ষেই দৃষ্ট ও অনুভবনীয়।

উপক - এর পরবর্তী চতুর্থ আবরণ কি 'সংস্কার- স্কন্ধ'?

বুদ্ধ - হ্যাঁ।

উপক - এটা কি?

বুদ্ধ - পূর্বেই বলেছি 'চৈতসিক' বাহান্ন প্রকার। এদের মধ্যে 'বেদনা' এক প্রকার চৈতসিক। আর 'সংজ্ঞা' আরেক প্রকার চৈতসিক। এ দু প্রকারের চৈতসিক' ব্যতীত চিত্তের বিভিন্ন দশায় শেষ যে পঞ্চাশ প্রকার চৈতসিক বা মানসিক প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় তাদের সামূহিকভাবে বলা হয় 'সংস্কার'। এক স্থিতি হতে আরেক স্থিতিতে স্বয়ং প্রবহমান থাকে এবং সংশ্লিষ্ট চিত্তকেও আমরণ ও অনির্বাণকাল প্রবহমান রাখতে সহায়ক হয় এ অর্থে এদের 'সংস্কার' বলা হয়।

তরঙ্গহীন জলে ঢিল ছুঁড়লে তা তৎক্ষণাৎ তলিয়ে যায়। তা তলিয়ে গেলেও তার মাধ্যমে সৃষ্ট তরঙ্গ-অনুতরঙ্গ ক্রমশ প্রশস্ততর হয়ে জলের উপরিভাগে অনেকক্ষণ বিদ্যমান থাকে। অনুভূত অনুকূল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-বিষয় গ্রহণ বা অননুকূল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়-বর্জন-জনিত মানসিক স্থিতির পরিবর্তনে ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে সে বিভিন্ন প্রকারের কর্ম সম্পাদন করে বসে। এই বিবিধ প্রকারের কর্মের মূল-স্থিতিকে 'সংস্কার'-শব্দে সংকেত করা হয়। নৈতিক মূল্যভেদে 'সংস্কার' তিন প্রকার - পুণ্যাভিসংস্কার, অপুণ্যাভিসংস্কার ও আনেঞ্জাভিসংস্কার। যে সংস্কারে পুণ্যের অভিবৃদ্ধি হয় তা পুণ্যাভিসংস্কার। যে সংস্কারে অপুণ্যের বৃদ্ধি হয় তা অপুণ্যাভিসংস্কার। পুণ্যের অভিবৃদ্ধিতে সহায়ক অথচ পুণ্যের পরিণাম প্রদান করে না এমন সংস্কারকে আনেঞ্জাভিসংস্কার বলা হয়।

প্রাণীর এ সংস্কার অতীতেও ছিল। বর্তমানেও ক্রিয়াশীল আছে। ভবিষ্যতেও অনির্বাণকাল থাকবে। এই তিন কালের কোন 'সংস্কার'-কে ত্যাগ না করে তাদের ক্রিয়া-শীলতাকে উল্লেখ করার উদ্দেশ্যে সামূহিক-ভাবে বলা হয় 'সংস্কার-স্কন্ধ।'

উপক - আপনার বিশ্লেষণ অতি সূক্ষ্ম ও বিশ্লেষণ শৈলীও অতি সুন্দর।

বুদ্ধ - যদিও বলছো আমার বিশ্লেষণ প্রণালী অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু নিজে বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারবে কত সূক্ষ্ম। যা হোক্ এখন 'বিজ্ঞান-স্কন্ধে'র প্রসঙ্গে আসা যাক্।

উপক - বেশ বলুন। এ যাবৎ আপনার কাছ হতে যা শুনেছি তাতে পূর্বানুমান হচ্ছে আপনার এই 'বিজ্ঞান' সাধারণ বিজ্ঞান না হয়ে নিশ্চয়ই অসাধারণ 'বিজ্ঞান' হবে।

বুদ্ধ - 'চিত্ত' ও 'চৈতসিকে'র অভিন্ন সম্বন্ধ সম্পর্কে পূর্বে বলেছি যে চৈতসিক-ধর্ম চিত্ত-ধর্মের সহভূ, সহগামী ও সহবিনাশশীল। সহভূ, সহগামী ও সহবিনাশশীল বলতে এখানে এক বিশেষ বিষয়কে (আলম্বন) কেন্দ্র করে এক বিশেষ চিত্তক্ষণে যে সব চৈতসিকের উৎপত্তি হয়, ঐ চিত্তক্ষণের স্থিতি ও বিনাশ-ক্ষণে ঐ সব চৈতসিকেরও স্থিতি এবং বিনাশ ঘটে। এদের অভিন্ন সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে আমাকে রথ ও রথের চাকার অভিন্ন সম্বন্ধের উপমা গ্রহণ করতে হচ্ছে। রথ ও রথের চাকা একই স্থলে, একই সময় আসে ও দণ্ডায়মান হয়, এবং একই সময় ঐ স্থান ত্যাগ করে। উপক! রথ এক স্থানে আর রথের চাকা আরেক স্থানে, এমন ঘটনা কি তোমার জানা আছে?

উপক - না, ভন্তে। এমন ঘটনার কথা আমার জানা নেই। এমন কি কারও মুখে কখন শুনিও নি। এটা সম্ভবও নয়।

বুদ্ধ - তুমি ঠিক বলেছ, উপক। কারণ, নানা প্রকারের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়েই রথের সৃষ্টি। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাইরে রথ নয়। অনুরূপভাবে এক বিশেষ বিষয়ের সংস্পর্শে উৎপন্ন 'বেদনা', 'সংস্কার', 'সংজ্ঞা'র সহস্থিতিতে একটি বিশেষ মানসিক স্থিতির উৎপত্তি হয়। বিষয়ের

পরিবর্তনে উৎপন্ন ঐ বেদনা, সংস্কার, ও সংজ্ঞারও পরিবর্তন হয়। তার সাথে ঐ মানসিক স্থিতির পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। এই বিশেষ মানসিক স্থিতিতেই অনুভূত বিষয় সম্পর্কে চিন্তন হয়। চিন্তন করে তাই চিত্ত। এই মানসিক স্থিতির চিন্তন প্রক্রিয়া বা কার্য-শৈলী বড়ই চিত্র-বিচিত্র। এ অর্থেও একে 'চিত্ত' বলা হয়। অনুভূত বিষয়ের ব্যাপারে 'বিশেষ জ্ঞান' বা বিজানন হয় বলে একে 'বিজ্ঞান'ও বলা হয়। তা অতীতেও ছিল। বর্তমানেও আছে। ভবিষ্যতেও থাকবে। তবে অতীতের বিদ্যমান বিজ্ঞান বর্তমানে নেই। বর্তমানের বিজ্ঞান অতীতে ছিল না। বর্তমানের 'বিজ্ঞান' ভবিষ্যতে হবে না। ভবিষ্যতের 'বিজ্ঞান' বর্তমানে উৎপন্ন হতে পারে না। অতীতের বিজ্ঞান, বর্তমানের বিজ্ঞান এবং ভবিষ্যতের বিজ্ঞানের মধ্যে কালের বা স্থানের ব্যবধান নেই। এদের মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বিদ্যমান। অনাদি-কাল হতে অনির্বাণকাল অবধি এই অবিচ্ছিন্ন বিজ্ঞানপ্রবাহ চলে। এই পরিবর্তন-শীল ত্রৈকালিক বিজ্ঞান-প্রবাহের অন্তর্গত কোন একটিকে বিশেষ বা কম গুরুত্ব না দিয়ে একত্রে সামূহিক-ভাবে বলা হয় বিজ্ঞান-স্কন্ধ।

উপক - যা শুনলাম, আর যা বুঝলাম, তাতে মনে হচ্ছে প্রাণী মাত্রেরই অস্তিত্ব পঞ্চস্কন্ধময়।

বুদ্ধ - তোমার ধারণা সম্পূর্ণ সত্যও নয়, আবার সম্পূর্ণ মিথ্যাও নয়।

উপক - তা কেন? তা হলে প্রাণীর আকার-আকৃতি ভেদ ছাড়া আরও কি কোন ভেদ রয়েছে?

বুদ্ধ - আকার-আকৃতির ভেদ ছাড়াও প্রাণীর বহুভেদ রয়েছে। এ সংসারে প্রাণীর সংখ্যা অসংখ্য। শ্রেণীভেদও অসংখ্য। তবে এক-বোকার-সত্ত্ব, চতু-বোকার-সত্ত্ব ও পঞ্চ-বোকার-সত্ত্ব ভেদে প্রাণীরা

মাত্র তিন প্রকারের।

উপক - এরা আবার কেমন প্রাণী? এদের নাম তো কখনও শুনি নি? তাদের বাস কোন্ নগরে?

বুদ্ধ - এই কাম-লোকের উর্দ্ধে রূপ-ব্রহ্ম-লোক নামে এক স্বর্গের অবস্থান রয়েছে। সেই রূপব্রহ্ম-লোকে অসংজ্ঞ-ব্রহ্ম শ্রেণীর ব্রহ্মগণ থাকেন। তাদের অস্তিত্ব বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, ও বিজ্ঞানাদি চার স্কন্ধের অভাবে কেবল রূপস্কন্ধময়। এদের বলা হয় এক-বোকার-সত্ত্ব।

রূপ-ব্রহ্মলোকের উর্দ্ধে অরূপ-ব্রহ্মলোকের-অবস্থান। এ ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মগণের অস্তিত্বে রূপ-স্কন্ধ ব্যতীত অবশিষ্ট চার স্কন্ধ বিদ্যমান। এ কারণে এরা চতু-বোকার-সত্ত্ব শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

এই অসংজ্ঞ-সত্ত্ব শ্রেণীর (ব্রহ্ম) ও অরূপলোকের ব্রহ্ম ব্যতীত সংসারের অবশিষ্ট সব শ্রেণীর প্রাণীর অস্তিত্ব পঞ্চ-স্কন্ধময়। অর্থাৎ আমরাও পঞ্চ-বোকার-সত্ত্ব শ্রেণীভুক্ত প্রাণী।

উপক - প্রভু! আপনি যে চার অনু-দর্শনের কথা একটু করে বলেছিলেন মনে হচ্ছে তা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

বুদ্ধ - চার অনুদর্শনের নামোল্লেখ করেছি মাত্র। প্রসঙ্গ পরিবর্তন হলেও আনুসঙ্গিক বিষয়েরই চর্চা চলছে।

উপক - ভন্তে। তা হলে বলুন কায়ানুদর্শনের প্রয়োজন ও ফলাফল কি? অবশ্য সকাল-সন্ধ্যা সব সময়ই হয় স্ব-কায়, না হয় পর-কায় দর্শন হয়। আর এই একই কাজ মানুষ আজন্ম অনন্তবার করে আসছে। পরের কথা না বলে নিজের কথাই বলি না কেন? কায়-দর্শনের মাধ্যমে কখনও স্মরণীয় কোন পরম সুখ, শান্তি ও সত্যের

সন্ধান পেয়েছি বলে তো আমার মনে হচ্ছে না। পরম সুখ, শান্তি ও সত্যের সন্ধান না পেলে কি হবে, যা পেয়েছি যা জেনেছি তা জানাতে আপত্তি কিসের? যৌবনে স্ব-কায় দর্শনে আত্ম-অহংকার ও মনোহারী নারীর কায়-দর্শনে সাময়িক সুখানুভূতির উপলব্ধি হয় একথা আমি নিজের অভিজ্ঞতায় জোর গলায় বলতে পারি। অথচ আপনি বলছেন এই কায়ানুদর্শন হল পরম সুখ, শান্তি ও সত্যের মোক্ষম মার্গ। যা হোক্ আপনি যখন বলছেন শুনতে আপত্তি কিসের? হয়ত হলেও হবে।

বুদ্ধ - 'কায়ে'র প্রতি কায়-দর্শনকারীর যে ধারণা বা দৃষ্টি আছে তা কতখানি সত্য বা মিথ্যা তার যথার্থ জ্ঞান কেবল কায়ানুদর্শনের মাধ্যমে অর্জন করা যায়।

উপক - এতো বেশ উপকারী? এই কায়ানুদর্শনের বিধি কি?

বুদ্ধ - কায়ানুদর্শনের ছয়টি বিধি রয়েছে। ছটি' বিধি এরূপ- আনাপান-স্মৃতি, ইর্যাপথ-স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞান-স্মৃতি, প্রতিকুল-মনসিকার, ধাতু-মনসিকার, শ্মশান-স্মৃতি।

উপক - ভন্তে, মনে হচ্ছে 'আনাপান'-শব্দ লেখ্য ভাষায় খুব একটা প্রচলিত নয়।

বুদ্ধ - তোমার অনুমান সত্য। কথ্য পল্লী ভাষায় শব্দটির প্রচলন বেশী। লেখ্য ভাষায় একে আশ্বাস-প্রশ্বাস' বলা হয়।

পঞ্চস্কন্ধময় প্রাণীর রূপস্কন্ধ (কায় বা দেহ) চার মহাভূত ও চার মহাভুত হতে উৎপন্ন ভৌতিক তত্ত্বের (উপাদারূপ) সম্মিশ্রণে গঠিত। সংসারের অস্তিত্ববান প্রতিটি পদার্থে অনিত্যতা বিদ্যমান। অনিত্যতার কারণে প্রতি নিয়তই ঐ চার মহাভূত ও চার মহাভূত হতে জাত

ভৌতিক তত্ত্বের বিনাশ ও সৃষ্টি হয়। কৃত কর্ম, ক্রিয়াশীল মানসিক স্থিতি, পরিপার্শ্বিক পরিস্থিতি, আবহাওয়া ও জলবায়ু এবং গৃহীত আহার (পোষক তত্ত্ব) আদির শুদ্ধি-অশুদ্ধিতার উপর প্রাণীর দেহের ভৌতিক তত্ত্বের সৃষ্টি ও বিনাশের হারের সাথে দেহের সুস্থতা ও অসুস্থতার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ।

দেহস্থ নিত্য নতুন 'পৃথিবী-ধাতু'র সৃষ্টি মূলত প্রাণীর গৃহীত স্থূল বা সূক্ষ্ম অন্নের পোষক-তত্ত্বে হয়। পেয় পদার্থ হতে নতুন জলীয় (আপো-) ধাতুর সৃষ্টি হয়। খাদ্য, ভোজ্য ও পেয় পদার্থ ও কৃত কর্ম এবং মানসিক শুদ্ধি-অশুদ্ধিতায় 'তেজ-ধাতু'র সৃষ্টির পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। দুষিত পুরাতন বায়ু-বর্জনের অনন্তর পর প্রাণী নতুন বায়ু গ্রহণ করে। নিয়মিত গৃহীত বায়ুর শুদ্ধি-অশুদ্ধিতার উপর শরীরের বায়বীয় তত্ত্বের (বায়ু ধাতু) নবীকরণের হ্রাস-বৃদ্ধির হার নির্ভর করে। মানসিক স্থিতির চঞ্চলতা ও প্রদূষণ বৃদ্ধিতে শ্বাস-প্রণালী ত্বরান্বিত ও স্থূল হয়। মানসিক স্থিতির শান্তি ও শুদ্ধিতার বৃদ্ধিতে শ্বাস-প্রণালী সূক্ষ্ম ও মন্দগতি সম্পন্ন হয়। প্রাণীর জীবন সীমিত। এই সীমিত জীবন আশ্বাস-প্রশ্বাস-ভেদে দুভাগে বিভক্ত। শ্বাস-গ্রহণকে আশ্বাস (আন) আর শ্বাস-ত্যাগকে প্রশ্বাস (আপান) বলা হয়। অতএব প্রাণীর জীবন আশ্বাস-প্রশ্বাসময়। আমি জনগণের কথায় গ্রাম্য ভাষায় ধর্মপ্রচার করি। গ্রাম্য ভাষায় বলা যায় জীবন 'আনাপান'ময়। এই আনাপানের সাথে কায়ের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট।

উপক - এই কামলোকীয় কায়ের সাথে আনাপানের অভিন্ন অঙ্গ। আমরা প্রাণীমাত্রই আজন্ম 'আনাপান' করে আসছি। এতে আবার নতুন করে করার কী রয়েছে?

বুদ্ধ - তোমার প্রশ্ন অতি সুন্দর। এ প্রশ্নের উত্তরে তোমাকে পাল্টা প্রশ্ন

করছি। বলত, উপক! এক ঢিলে দুই বা ততোধিক ফল বৃন্তচ্যুত করা চতুর ব্যক্তির লক্ষণ, না ঢিলের পর ঢিল ছুঁড়ে একটি ফলও বৃন্তচ্যুত করতে না পারাটা?

উপক - এক ঢিলে দুই বা ততোধিক ফল বৃন্তচ্যুত করাই চাতুরামীর লক্ষণ। লাভপ্রদও বটে।

বুদ্ধ - একজনের ঢিলে এক বা দুই বা ততোধিক ফল বৃন্ত-চ্যুত হয়। আরেকজন ঢিলের পর ঢিল ছুঁড়ে একটি ফলও বৃন্ত-চ্যুত করতে পারে না। কেন? এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ কিসে?

উপক - দু জনের ঢিল ছোঁড়ার প্রণালী ভিন্ন। প্রথমজনের ঢিল ছোঁড়ার মধ্যে সতর্কতা বিদ্যমান। ঢিল ছোঁড়ার উদ্দেশ্যও স্থির। কিন্তু অপরজনের ঢিল ছোঁড়ার মধ্যে অসতর্কতা বিদ্যমান এবং তা নিরুদ্দেশ্যপূর্ণ।

বুদ্ধ - এই অসতর্ক ব্যক্তি যদি সতর্কতা অবলম্বন করে আর উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে ঢিল ছোঁড়ে তবে তার ঢিলে এক বা একাধিক ফল বৃন্ত-চ্যুত হবে কি না?

উপক - নিশ্চয়ই হবে।

বুদ্ধ - সাধারণ প্রাণী বা মানুষের 'আনাপান' জীবন-যাপনের এক যান্ত্রিক প্রক্রিয়া মাত্র। যন্ত্র চলে। কিন্তু কেন চলে সে জানে না। এ চলার সার্থকতা কোথায় তাও সে জানে না। সাধারণ প্রাণীর কায়ে অনায়াসে 'আনাপান' হয়, কিন্তু তা নিরুদ্দেশ্য-পূর্ণ। এদের 'আনাপান' 'স্মৃতি'-যুক্ত নয়। স্মৃতি-যুক্ত নয় বলে 'স্মৃতি'-উত্থানেও তা সহায়ক নয়।

নিরুদ্দেশ্য 'আনাপান' আনাপানকারীর স্বাস্থ্য বা স্মৃতি কোনটিরই

বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় না। এ ধরণের 'আনাপান' তার কর্মক্ষমতার অপচয়তুল্য হয়। নিয়মিত ও সংযমিত আনাপানের সুফল সম্পর্কে অনবহিত থাকায় 'আনাপান' নেওয়া সত্ত্বেও 'আনাপানে'র সুফল লাভে বঞ্চিত থাকে। অথচ অন্যদিকে সাধক-সাধিকার প্রতিটি 'আনাপান' 'স্মৃতি'-যুক্ত হয়। 'স্মৃতি'-যুক্ত 'আনাপান' স্মৃতি-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়। এভাবে আনাপানময় জীবন স্মৃতিময় হয়। নিয়মিত ও সংযমিত 'আনাপানের' সুফল সম্পর্কে অবহিত থাকায় সাধক-সাধিকাগণ একে 'স্বাস্থ্য' ও 'স্মৃতি' বৃদ্ধির কাজে প্রয়োগ করেন। নিয়মিত ও নিরন্তর প্রয়াসে তাঁরা এ দুর্লভ সম্পত্তির অধিকারী হন। স্মৃতি-বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাধি, আর সমাধি বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রজ্ঞার সৃজন হয়। আর প্রজ্ঞালোকে নির্বাণ প্রত্যক্ষীভূত হয়। এই নির্বাণ-প্রাপ্তির সহায়ক 'স্মৃতি'-সাধনার জন্যে প্রয়োজন হয় এক 'আলম্বনের'। সাকার ও নিরাকার ভেদে আলম্বন দু প্রকার।

ইষ্ট দেব-দেবীর কাল্পনিক মূর্তি সম্মুখে রেখে বা যে কোন আকার সম্পন্ন আলম্বনকে অবলম্বন করে মনোনিবেশ করার প্রচলন সমাজে রয়েছে। কিন্তু সাকার-আলম্বনের আকার-প্রকার গোচরীভূত হওয়া, না হওয়া, এবং এর উপস্থিতি-অনুপস্থিতি সাধক-সাধিকার সমাধির স্থিতি বহুলাংশে নির্ভরশীল। অনেক স্থলে সাকার-আলম্বন অবলম্বনে চিত্ত-বিকৃতির প্রভূত সম্ভাবনা বা দুর্ভাবনা প্রকটিত হয়। সাকার-আলম্বন অবলম্বনে দোষ দর্শন করি।

ভারতীয় সব সাধনায় সাধক-সাধিকাকে সাকার হতে নিরাকার, স্থূল হতে সূক্ষ্ম, সসীম হতে অসীম আলম্বন অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়। প্রাণীর চঞ্চল মন সদা সর্বদা সাকার, স্থূল ও সসীম আলম্বন অবলম্বনে বা চয়নে অভ্যস্ত। সাকার, সসীম ও স্থূল আলম্বন সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে হঠাৎ নিরাকার, নিঃসীম ও সূক্ষ্ম আলম্বন

অবলম্বন করা তার পক্ষে কদাপি সম্ভব নয়। এ কারণে সাকার আলম্বনকে প্রারম্ভিক আলম্বনরূপে প্রয়োগ করা হয়। সাধক-সাধিকার চরিত্রানুসার লাভপ্রদ দৃশ্যমান সাকার আলম্বন সব সময় সুলভ নয়। অনুরূপ আলম্বন চয়নে অযথা কালক্ষয় হয়। অনুরূপ আলম্বন চয়নে অযথা কালক্ষয় না হয় এ উদ্দেশ্যে আমরা সাধকের সহজলভ্য 'আনাপান'কে আলম্বনরূপে প্রয়োগ করি। প্রাণীমাত্রেরই নিত্য সঙ্গী হওয়ায় 'আনাপান' একটি সুলভ আলম্বন। বায়ুর নিজস্ব দৃশ্যমান কোন আকার-প্রকার নেই। কিন্তু নাসিকা-ছিদ্রে প্রবেশক্ষণ হতে এর সঞ্চরণ-পথের আকার-প্রকারের উপর এই বায়ুর আকৃতি-প্রকৃতি নির্দ্ধারিত হয়। জলের নিজস্ব আকার-প্রকার না থাকা সত্ত্বেও পাত্র ও পরিস্থিতি অর্থাৎ পাত্রের আকার-প্রকার ও রঙ্গ অনুসারে জলের আকার-প্রকার ও রঙ্গ বদলায়। অনুরূপ-ভাবে বায়ুর আকার-প্রকার না থাকা সত্ত্বেও 'আন' আর 'অপানের' গতি-বিধির আকার-প্রকার রয়েছে। এ 'আন' আর 'অপান' জনিত গতি-বিধির নিষ্পক্ষ পর্য্যবেক্ষণ করাই সাধক-সাধিকার করণীয় কর্ম ও ধর্ম। 'আন' আর 'অপানে'র গতি-বিধিতে 'স্মৃতি' বা মনোযোগ স্থাপন করার অপর নাম 'আনাপান-স্মৃতি'। 'আনাপান-স্মৃতি'-সাধনায় সাকার আলম্বনের দৃষ্টিগোচরীভূত হওয়া বা না হওয়া জনিত দুর্ভাবনা স্মৃতি-সাধনাকারীর মনে কোন প্রকারের চিত্ত-বিকৃতি বা চিত্ত-চাঞ্চল্যতা সৃষ্টি করতে পারে না। সসীম হতে অসীম অন্তর্জগতে প্রবেশ করার সর্বজনের উপযোগী ও সর্বকালের উপযোগী সাকার সোপান-মালা হল এ আনাপান-স্মৃতি। এ সাকার সোপান-মালা বেয়ে সাধক-সাধিকা নির্বাণ-নগর-গামী মোক্ষম্ মোক্ষ-মার্গে আরূঢ় হন। এ কারণে বৌদ্ধ সাধনা জগতে 'আনাপানস্মৃতি'র গুরুত্ব সর্বাধিক। নির্বাণ-নগরীর প্রবেশ-পথের প্রথম দ্বার বা দ্বাররক্ষী হল স্মৃতি।

উপক - 'আন' আর 'অপান' এর গতিবিধিকে কেন্দ্র করে 'আনাপানস্মৃতি' কিভাবে করতে হয়?

বুদ্ধ - 'আনাপানস্মৃতি'-সাধনার অভ্যাসের পূর্বে সাধনায় ইচ্ছুক ব্যক্তিকে এক অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত কল্যাণমিত্রের (ভিক্ষু) নিকট উপস্থিত হতে হয়। মনের ভাব ব্যক্ত করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়ে তার নিকট 'নিবার্ণ-মার্গের' প্রার্থী হতে হয়।

উপক - এর পর করণীয় কি?

বুদ্ধ - কল্যাণমিত্র আনাপান-স্মৃতি প্রার্থীর যোগ্যতা-অনুসারে তাকে শীলে প্রতিষ্ঠিত করান এবং তাকে শীল-বিশুদ্ধি অটুট রাখার পরামর্শ দেন। এর পর গুরুর নির্দেশানুসারে সাধককে এক উপযুক্ত স্থান চয়ন করতে হয়।

উপক - স্থান আর স্মৃতি-সাধনার সম্বন্ধ কিসে?

বুদ্ধ - অনুকূল স্থান আর পরিবেশ সাধকের সাধনা-সিদ্ধিতে সহায়ক হয়। আর প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতি সাধকের স্মৃতি-সাধনায় বাধক ধর্মের সৃষ্টি করে। এ কারণে স্থান চয়নের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

উপক - কেমন স্থান সাধকের অনুকূল হয়?

বুদ্ধ - নবাগন্তুক স্মৃতি-সাধকের জন্যে নির্জন শূন্যাগার সবচেয়ে অনুকূল স্থান। শূন্যাগারের অভাবে গ্রাম বা নিগমের নির্জন প্রান্তস্থিত বৃক্ষমূলও চয়ন করা যেতে পারে। নির্ভীক ও অভ্যস্ত সাধক-সাধিকার পক্ষে নির্জন ঘনারণ্য প্রদেশের এক ভূভাগ বা বৃক্ষমূল তার সর্বোত্তম সাধনা-স্থল (কর্মভূমি)। এ তিনটির মধ্যে সুলভ ও চরিত্রানুকূল স্থল-চয়নের পর আসে আসন-চয়নের পালা।

উপক - কোন্ আসন স্মৃতি-সাধনায় সর্বাপেক্ষা সহায়ক?

বুদ্ধ - পূর্ণ পদ্মাসন। এ ছাড়া অর্দ্ধ-পদ্মাসন বা সুখাসনেও স্মৃতি-সাধনা সম্ভব। বারম্বার আসন ও স্থান পরিবর্তন করা হলে চিত্ত-চাঞ্চল্যতা বৃদ্ধি পায়। এ কারণে স্মৃতি-সাধককে তার সাধনার প্রারম্ভিক স্তরে প্রতিদিন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে ও আসনে এবং এক নির্দ্দিষ্ট সময় অবধি বসার অভ্যাস করতে হয়। একান্ত-সেবনে রুচি বৃদ্ধি করতে হয়। আসন-সিদ্ধি বলতে শুধু শরীরের নিম্ন অঙ্গের যথেচ্ছা প্রয়োগে কুশলী হওয়া বোঝায় না, এতে শরীরের উর্দ্ধ-অঙ্গ প্রয়োগেও কুশলী হতে হয়। পূর্ণ-পদ্মাসন/ অর্দ্ধ-পদ্মাসন/ সুখাসনে বসে নাভি-স্থলের নীচে দুই পদতলের মাঝে বা কোলে বাম হাতের তল চিৎ করে রেখে তার উপর ডান হাতের তল অনুরূপ ও স্বাভাবিক ভাবে রাখতে হয়। এভাবে বসার পর না হেলিয়ে, না দুলিয়ে, না বাঁকিয়ে না ঝুঁকিয়ে শরীরের কোন অংশে আরষ্টতা বা জড়তা সৃষ্টি না করে শিরদাঁড়া সোজা রেখে ক্রমান্বয়ে দীর্ঘকাল একই আসনে বসার অভ্যাস করতে হয়।

উপক - এঁকিয়ে, বেঁকিয়ে, ঝুঁকিয়ে বসলে কি কোন মারাত্মক ক্ষতি হয়?

বুদ্ধ - হ্যাঁ, মারাত্মক ক্ষতি হয়। এঁকিয়ে বেঁকিয়ে বসলে সাধকের মনে নানা ধরণের অনর্থক প্রশ্ন বা সন্দেহ উঁকি মারে। মন চঞ্চল হয়। হেলিয়ে বা ঝুকিয়ে বসলে নিন্দ্রা- তন্দ্রা আলস্যাদি মানসিক বিকার উৎপন্ন হয়। এর সাথে এসবের সহগামী বাধক-ধর্মগুলোও উৎপন্ন হয়। এসবের উপস্থিতিতে সাধনায় সিদ্ধিপ্রাপ্তি সম্ভব নয়। শিরদাঁড়া সোজা রাখলে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রক্ত ও বায়ু সঞ্চারণ কোন প্রকারে বিঘ্নিত হয় না। বেঁকিয়ে বা ঝুঁকিয়ে রাখলে রক্ত বা বায়ুর

স্বাভাবিক সঞ্চরণ বিঘ্নিত হয়। এতে নানাধরণের শারীরিক বিকার এবং পরিণামে মানসিক বিকারেরও সৃষ্টি হয়। এসব বাধক-বিকার ধর্ম হতে শরীর ও মনকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে সাধককে তার মাথা ও শিরদাঁড়া সোজা রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়।

উপক - এর পর কি করতে হয়?

বুদ্ধ - এর পর সাধককে তার আশ্বাস-প্রশ্বাস-প্রণালীর সামান্য জ্ঞান সঞ্চয় করতে হয়।

উপক - এতে জ্ঞান সঞ্চয়ের এমন কি রয়েছে? এতো স্বাভাবিকভাবে হয়ে যায়।

বুদ্ধ - আশ্বাস্-প্রশ্বাস-প্রণালীর প্রভেদ এবং এই প্রভেদের সাথে মানুষের ইচ্ছা-শক্তির কোন আন্তরিক সম্বন্ধ রয়েছে কি না, তার সামান্য জ্ঞান অর্জন করাই এই জ্ঞান-সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য।

শরীরের নানা দরজা দিয়ে অহরহ বায়ুর প্রবেশ ঘটছে। তবে মুখদ্বার ও নাসিকা-ছিদ্র দুটি এদের মধ্যে মুখ্য। মুখদ্বার ও নাসিকাদ্বারে প্রবিষ্ট বায়ু গলনালী হয়ে হৃদয়-তন্ত্রে পৌঁছোয়। পরিশুদ্ধ বায়ু নাভিস্থলে পৌঁছে শরীরের সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সঞ্চারিত হয়। অন্ততো গত্বা শরীরে প্রবিষ্ট বায়ু চিত্ত, কর্ম, ঋতুর সংযোগে বাচসিক কর্মের সম্পাদনে ও হস্ত-পাদের সঞ্চালন, সংকোচন-প্রসারণ, দাঁড়ান, গমন; বসন ও শয়নাদি নানাবিধ স্থুল কর্ম-সম্পাদনে সহায়ক হয়। বায়ুর সঞ্চরণে শরীর হাল্কা ও গতিশীল থাকে। শরীরস্থ দুষিত বায়ুও শরীরের নানা দ্বার দিয়ে বের হয়। তবে মুখদ্বার, নাসিকা ছিদ্র-দুই ও গুহ্যদ্বার এ তিনটি এদের মধ্যে মুখ্য বহির্গমন দ্বার। পুন এদের মধ্যে নাসিকা-ছিদ্র, দুটি দিয়ে প্রবিষ্ট বায়ুকে 'আশ্বাস' (**আন পস্সাসো তি অন্তো পবিসনবাতো**) আর নির্গত বায়ুকে 'আশ্বাস' (**অপান অস্সাসো**

তি বহিনিক্খমনবাতো) বলা হয়। শরীরের অন্য দ্বার দিয়ে প্রবিষ্ট ও নির্গত বায়ুকে আশ্বাস-প্রশ্বাস বা আনাপান বলা হয় না।

উপক - আশ্বাস-প্রশ্বাসে প্রভেদ হয় কেন?

বুদ্ধ - মানসিক স্থিতি ও চিত্ত-চাঞ্চল্যতা ভেদে।

উপক - কত রকমের হয়?

বুদ্ধ - আকারভেদে অনেক প্রকারের হলেও মোটামুটিভাবে দু প্রকারের ----হ্রস্বাকার ও দীর্ঘাকার।

উপক - এদের কোন্‌টি হ্রস্বাকার আর কোন্‌টি দীর্ঘাকার?

বুদ্ধ - শরীরে প্রবিষ্ট বায়ু-সঞ্চরণের ক্ষেত্র নাসিকা-ছিদ্রদুয়ের অগ্রভাগ হতে আরম্ভ করে গলনালী, গলনালী হয়ে নাভিস্থল এবং নাভিস্থল হয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়ে থাকে। তবে নাভিস্থল হতে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বায়ুর সঞ্চরণ-প্রণালী অতি সূক্ষ্ম-প্রকৃতির। সাধারণ জনের পক্ষে তার অনুভব সম্ভব নয়। সাধারণজন সামান্য প্রয়াসেই নাসিকা-ছিদ্র দুয়ের অগ্রভাগ হতে নাভিস্থল অবধি বায়ুর সঞ্চরণ-প্রণালী অনুভব করতে পারে। নাসিকা-ছিদ্র দুয়ের অগ্রভাগ হতে নাভিস্থল অবধি আকার-সম্পন্ন শ্বাসকে দীর্ঘাকার-শ্বাস বলা হয়। অনুরূপভাবে নাভিস্থল হতে নাসিকা-ছিদ্র দুয়ের অগ্রভাগ অবধি আকার- সম্পন্ন প্রশ্বাসকে দীর্ঘাকার-প্রশ্বাস বলা হয়। চঞ্চল ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি তরান্বিত হয়। গতি তরান্বিত হলে এক একটি শ্বাস বা প্রশ্বাস তার নিয়ত দুরত্ব একবারে অতিক্রম করতে পারে না। ফলে তার পূর্ণ অনুভূতিও সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ ধরণের শ্বাস-প্রশ্বাসকে হ্রস্বাকার শ্বাস-প্রশ্বাস বলা হয়। হ্রস্বাকার শ্বাস-প্রশ্বাসেরও আবার প্রভেদ রয়েছে। কিছু শ্বাস এমনও আছে যা

গল-নালীর অভ্যন্তর-ভাগে প্রবেশ না করে মুখদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যায়। আবার অনেক সময় মুখ-দ্বারে প্রবিষ্ট বায়ু গলনালী দিয়ে অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ না করে প্রশ্বাস-আকারে বেরিয়ে যায়। আবার কিছু বায়ু এমন আছে যা শ্বাস-আকারে প্রবেশ করে তার পর মহূর্তেই প্রশ্বাস-আকারে বেরিয়ে যায়। এমন শ্বাস-প্রশ্বাস আকারে হ্রস্বতম হয়।

উপক - দীর্ঘ আশ্বাস-প্রশ্বাস উপকারী না হ্রস্ব আশ্বাস- প্রশ্বাস?

বুদ্ধ - আশ্বাস-প্রশ্বাস মাত্রই উপকারী। তবে শান্ত চিত্তে দীর্ঘ আশ্বাস-প্রশ্বাস হয়, অতএব তা হ্রস্ব আশ্বাস-প্রশ্বাস অপেক্ষা অধিক হিতকারী। আশ্বাস-প্রশ্বাস হ্রস্ব বা দীর্ঘ করা আমাদের স্মৃতি-সাধনার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য শারীরিক ক্রিয়া ও মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে একটি অভিন্ন সঙ্গতি স্থাপন করা। সাধারণ প্রাণী বা মানুষ শারীরিক ক্রিয়া-কলাপে ও মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। যেমন- যখন সে আশ্বাস-প্রশ্বাস নেয় তখন আশ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কে চিন্তা না করে অন্য ভূত-ভবিষ্যৎ বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করে। যখন সে বসে, তখন সে শোবার কথা চিন্তা করে। যখন সে গমন করে তখন বসার বা দৌড়বার কথা চিন্তা করে। এভাবে শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়ায় সঙ্গতি না থাকায় শারীরিক-কর্ম নিপুণ হয় না। এভাবে বাণীকর্ম ও মনকর্মে সামঞ্জস্য না থাকায় বাণী-কর্ম নিপুণ হয় না। শারীরিক ও বাচনিক কর্মে নিপুণতা অর্জনের উদ্দেশ্যে শারীরিক ও মানসিক এবং বাচনিক ও মানসিক কর্মের মধ্যে সঙ্গতি আনয়ন করা নিতান্ত আবশ্যক। ধ্যান-অভ্যাসকালে সাধক-সাধিকাগণকে বাচনিক ও শারীরিক কর্ম সীমিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়। অধিক কর্মে এদের সঙ্গতি স্থাপন করা এক দুষ্কর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ধ্যানাসনে বসে সাধক-সাধিকাগণ বাচনিক-কর্ম পরিপূর্ণরূপে সীমিত করে ফেলেন। অন্য শারীরিক কর্মেও তারা নিয়ন্ত্রিত ও সংযমিত হন। কায়িক-

বাচনিক পাপকর্ম হতে সাময়িক বিরতি প্রাপ্ত হলেও পাপ-প্রবৃত্তি হতে সাধক-সাধিকার মন পূর্ণত মুক্ত হয় না। এ কায়হীন দুরন্ত চঞ্চলচিত্তকে শান্ত করাই আনাপান-স্মৃতি-সাধনার প্রথম উদ্দেশ্য। দক্ষ শিকারী (ব্যাধ) বন্য পশু-শিকারের উদ্দেশ্যে গোপনে অনুধাবন করত ঐ পশুর গোচর-ভূমির সন্ধান করে। গোচর-ভূমির সন্ধানের পর সে ক্রমশ পশুর নিকটবর্তী হয়ে তাকে করায়ত্ত করে। এভাবে এ দুরন্ত মনকে ধরতে বা জানতে হলেও এর চিন্তনীয় (ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য) বিষয়ের অনুধাবন করতে হয়। এ ছাড়া একে করায়ত্ত করার আর কোন সুগম পন্থা নেই। চিন্তনীয় বিষয় ব্যতীত মনের চিন্তন প্রক্রিয়া গতি-হীন হয়ে পড়ে। চিন্তনীয় বিষয়ের অনন্তর দ্রুত পরিবর্তনে এর ক্রিয়াশীলতাও গতি প্রাপ্ত হয়। মনের চিন্তনীয় বিষয় ছয় প্রকার। পাঁচ কায়েন্দ্রিয়ের পাঁচ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় আর মনিন্দ্রিয়ের স্বতন্ত্র পৃথক্ বিষয় (ধর্ম/ধারণা/অবধারণা) রয়েছে। মনিন্দ্রিয়ের এই স্বতন্ত্র পৃথক্ আলম্বন (ধর্ম) প্রকৃতিতে অতি সূক্ষ্ম স্তরের। নবাগন্তুক সাধক-সাধিকার পক্ষে তার অনুধাবন করা দুরূহ ব্যাপার। কাজেই ধ্যান-অভ্যাসের প্রারম্ভিক অবস্থায় পাঁচ কায়িক ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-বিষয় স্থূল প্রকৃতির হওয়ায় এদের অনুধাবন করা সাধক-সাধিকার পক্ষে অপেক্ষাকৃতভাবে সহজ হয়। এদের মধ্যে আবার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা- এ চার ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়- রূপ, শব্দ, ঘ্রাণ, আর রস অপেক্ষা কায়-ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় স্পৃষ্টব্য বিষয় অধিকতর স্থূল প্রকৃতির। উপরোক্ত চার কায়িক ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-বিষয় অনুধাবনকালে নবাগন্তুক সাধক-সাধিকার চিত্ত-বিকৃতি বা চিত্ত-চাঞ্চল্যতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা অধিক থাকে। কায়-ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য স্পৃষ্টব্য বিষয় অধিকতর স্থূল। তার উপর এই কায়-ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্র আপাদমস্তক অতি প্রশস্ত । অতি প্রশস্ত হওয়ায় এই কায়-ইন্দ্রিয়ের নানা স্থানে

একই সময়ে নানা ধরণের অনুভূতি হয়ে থাকে। কায়-ইন্দ্রিয়ে অনুভূত বিভিন্ন অনুভূতির সঠিক অনুধাবণ করা কষ্ট-সাধ্য হয়। এতে চিত্ত-চাঞ্চল্য হ্রাস পাবার স্থলে বরংচ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

এ কারণে প্রশস্ত কায়-ইন্দ্রিয়ের অনুভূত অনুভূতিকে স্মৃতি-সাধনার অবলম্বন হিসেবে প্রাথমিক অবস্থায় প্রয়োগ করা হয় না।

উপক - প্রারম্ভিক স্মৃতি-সাধনায় কেবল 'আনাপান'কে কেন প্রয়োগ করা হয়, ভগবান?

বুদ্ধ - অন্য কায়-ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাহ্যিক বিষয়ের আগমনে বা উপস্থিতিতে বা সংস্পর্শেই কেবল সে সবের অনুভব সম্ভব। এসবের অনুপস্থিতিতে অনুভব অসম্ভব। অনুভবের অভাবে স্মৃতি-সাধনা সম্ভব নয়। কিন্তু ওসবের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি সব সময় মানুষের ইচ্ছাধীনে হয় না। স্মৃতি-সাধনার বিষয় এমন হওয়া উচিত যা অনায়াসে সর্বদা সুলভ। এ সংসারে 'আনাপান'ই একমাত্র এমন অবলম্বন যা অনায়াসে সর্বদা সুলভ। 'আনাপানে'র অনুভূতি কেবল নাসিকাদ্বারে সম্ভব হয়।

উপক - ভন্তে, নাসিকাদ্বারের কি তবে দুটি কাজ?

বুদ্ধ - তা কেন?

উপক - 'আনাপানের' অনুভূতি আর সুগন্ধ-দুর্গন্ধাদির অনুভূতি বা বিজানন নাসিকাদ্বারে হয়ে থাকে। তাই ।

বুদ্ধ - আপাত-দৃষ্টিতে 'আনাপান' ও ঘ্রাণ-গ্রহণ নাসিকাদ্বারে হয় মনে হয়। কিন্তু বস্তুত তা নয়। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের পৃথক্ পৃথক্ বিষয় রয়েছে। চোখের বিষয় রূপ, কানের বিষয় শব্দ, নাকের বিষয় ঘ্রাণ, জিহ্বার বিষয় রস, কায়ের বিষয় স্পৃষ্টব্য তত্ত্ব। এক ইন্দ্রিয় অন্য

ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণে অসমর্থ। নাসিকার যে তত্ত্ব বা গুণ সমুহ দিয়ে ঘ্রাণ-গ্রহণ সম্ভব, তা দিয়ে 'আনাপান'-বিজানন সম্ভব নয়। 'আনাপান' আর ঘ্রাণের প্রবেশ দ্বার এক হলেও গুণগতভাবে সেখানে দুই ইন্দ্রিয়ের সমাবেশ রয়েছে। নাসিকার যে যে অংশে আনাপানের বিজানন হয় তা বস্তুত কায়-ইন্দ্রিয়ের অংশ-বিশেষ মাত্র।

উপক - স্থান-চয়ন, আসন-সিদ্ধি ও শ্বাস-প্রশ্বাস প্রণালীর সামান্য প্রাথমিক জ্ঞান সঞ্চয় করার পর সাধককে আর কি করতে হয়?

বুদ্ধ - এর পর স্মৃতি-(উপ-) স্থাপন।

উপক - 'স্মৃতি' কোথায় আর কিভাবে স্থাপন করতে হয়?

বুদ্ধ - হ্যাঁ, এবার সেটাই বলছি। এবার সাধকের কর্তব্য বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করা। পাঁচ কায়িক ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু- ইন্দ্রিয় সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। অল্পেতেই বিকৃত হবার সম্ভাবনা এতে বেশী। এ কারণে জন্মলগ্ন হতেই অধিকাংশ শ্রেণীর প্রাণীর চোখে পাতা থাকে। ইচ্ছা মাত্রে চোখের পাতা ফেলা বা মেলা যায়। বহির্জগতের বিদ্যমান বস্তু আকারে প্রকারে রঙ্গে-রূপে অন্য বিষয়াপেক্ষা সর্বাধিক আকৃষ্ট করে। আবার প্রাণীর চোখের গঠন-প্রকৃতিও এমন যে সে ইচ্ছামাত্রই চোখের পাতা ফেলে বাহ্যিক দৃশ্যমান জগতের সম্বন্ধ অনায়াসে ছিন্ন করতে পারে। অনুরূপভাবে মুখাগ্রের উপরের ও নীচের ঠোঁট দুটি একত্রে আনা হলে জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বাহ্যিক রস-জগতের সম্বন্ধ ছিন্ন হয়। অপর দুটি অর্থাৎ কান ও কায়-ইন্দ্রিয় স্বভাবতই অনাবৃত থাকে। কৃত্রিমভাবে আবৃত করা গেলেও এদের অনুভূতি-শক্তিকে আবৃত করা যায় না। অপ্রাকৃতিক উপায়ে সমস্যার সাময়িক সমাধান সম্ভব হলেও তা স্থায়ী হয় না। পরিণামে সমস্যা বৃদ্ধি পায়। অবশেষ ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকা-নলী দুয়ের অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত। নাসিকা-নলী

দুটি শ্বাস-প্রশ্বাসের এক অন্যতম মার্গ। জীবন-ধারণের একমাত্র সহজ মার্গ হওয়ায় তা সব সময়ই অনাবৃত থাকে। মুখ-মার্গে আশ্বাস-প্রশ্বাস সম্ভব হলেও তা অনবরুদ্ধ মুখ্য মার্গ নয়। কোন কারণে নাসিকানলী অবরুদ্ধ হলে সাময়িক-ভাবে আশ্বাস-প্রশ্বাস হেতু মুখ-মার্গের প্রয়োগ করা হয়।

এ কারণে সাধকগণ বাহ্যিক জগতের সম্বন্ধ ছিন্ন করার সংকেত রূপে দু চোখ বন্ধ করেন। দাঁতে দাঁত রেখে ওঠের উপর ওঠ রাখেন। চোখ বন্ধ করতেই মন পলকে কিছুটা আত্ম-কেন্দ্রিক (অন্তর্মুখী) হয়ে পড়ে। সাথে মনোহারী শব্দ, গন্ধ বা রসের আগমন যদি ঐ সময় না ঘটে বা তাদেরকে ঘটতে না দেওয়া হয় তবে বহির্মুখী মন আপনা-আপনিই আরো কিছুটা অন্তর্মুখী হতে থাকে। অন্তর্মুখী হতে থাকলেও মন তার চঞ্চলতা তখনও ত্যাগ করে না। কারণ ঐ অন্তর্মুখী মনে 'স্মৃতি' নেই।

উপক - এই 'স্মৃতি' কি?

বুদ্ধ - অপ্রমত্ততাই 'স্মৃতি' অর্থাৎ 'যখন যা, তখন তা' জানাকেই বলা হয় 'স্মৃতি'।

উপক - 'স্মৃতি' কোথায় উপস্থাপন করতে হয়?

বুদ্ধ - সব কাজে। তবে 'আনাপান'-সাধনা করা কালে কেবল 'আনাপানের' অনুভূতিতে 'স্মৃতি'-স্থাপন করতে হয়।

উপক - কি-ভাবে?

বুদ্ধ - সাধককে তার অন্তর্দৃষ্টি (মন) উপরি ওঠের মধ্যভাগে এবং নাসিকা-নলী দুয়ের সন্ধিস্থলের অগ্রভাগে স্থির করে স্বাভাবিক গতিতে আশ্বাস নিতে হয়। আশ্বাস নিলে 'আশ্বাস নিচ্ছি' জানতে হয়।

উপক - কি করে জানবো? আমি আশ্বাস নিচ্ছি?

বুদ্ধ - শ্বাস-গ্রহণ কালে নাসিকা-নলী দুয়ের অগ্রভাগে বায়ু দু-ভাগে বিভক্ত হয়। দু-ভাগে বিভক্ত বায়ু নাসিকানলী দুয়ের গোলাকার ছিদ্রে আশ্বাস-আকারে প্রবেশ করে। প্রবেশকালে নাসিকানলীর ছিদ্রে স্পর্শ হয়। স্পর্শ হতে বেদনা বা অনুভূতির উৎপত্তি হয়। স্বাভাবিক অনুভূতি কখন শীতল, কখন উষ্ণ, কখন নাতিশীতোষ্ণময় হয়। শীতল অনুভূতি হলে 'শীতল অনুভূতি হচ্ছে' জানতে হয়। উষ্ণ অনুভূতি হলে 'উষ্ণ অনুভূতি হচ্ছে' জানতে হয়। আশ্বাস নেওয়াটা শারীরিক ক্রিয়া (কায়-সংস্কার) মাত্র। আভিধার্মিক শব্দাবলীতে একে 'রূপ'ও বলা হয় । আশ্বাস-গ্রহণ কালে অনুভূত শীত বা উষ্ণ বা শীতোষ্ণ অনুভূতির (সতর্কতার সাথে) জানা থাকাটাই 'স্মৃতি'। অনুভূতি বা বেদনা মনের (নামের) একটি অঙ্গ। 'স্মৃতি' এই মন বা নামের আরেকটি অঙ্গ (চৈতসিক)। অনুভূতির সাথে 'স্মৃতি'কে যুক্ত করার অপর নাম স্মৃতি-(উপ-)স্থাপন।

উপক- 'স্মৃতি' ও স্মৃতি-উপস্থাপন কি? তা সুন্দরভাবে বুঝলাম। এবার বলুন কিভাবে স্মৃতি-উপস্থাপন করতে হয়?

বুদ্ধ - বেশ, মনোনিবেশ কর তা হলে।

উপক - বেশ, করলাম।

বুদ্ধ - সাধককে কৃত্রিম উপায়ে দীর্ঘ বা হ্রস্বাকার না করে স্বাভাবিকভাবে আশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হয়। আশ্বাস নেবার কালে আশ্বাসের অনুভূতি অনুভব করে 'অনুভব হচ্ছে' বা 'আশ্বাস নিচ্ছি'-জানতে হয়। প্রশ্বাস-কালেও প্রশ্বাসের অনুভব হয়। প্রশ্বাসের অনুভূতির অনুভবের সাথে সাধককে জানতে হয় 'অনুভব হচ্ছে' বা 'প্রশ্বাস ত্যাগ' করছি।

উপক - সব সময়ই কি স্বাভাবিক আশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে বা ত্যাগ

করতে হয়? তা কি সম্ভব? আপনি তো বললেন কখনও হ্রস্ব (ছোট), কখনও বা দীর্ঘ (লম্বা) হয়। হ্রস্ব হলে কি করতে হবে তখন?

বুদ্ধ - এখানে স্বাভাবিক বলতে অনায়াসে যা হয় তাকে বোঝায়। অনায়াসে আশ্বাস যদি দীর্ঘ হয়ে যায় তবে ওর সাথে অনুভূতিও দীর্ঘ হবে। তখন দীর্ঘ-আশ্বাস অনুভব হচ্ছে বা 'দীর্ঘ-আশ্বাস নিচ্ছি' জানতে হয়। দীর্ঘ-প্রশ্বাস হলে অনুভূতিও দীর্ঘ হবে। তখন 'দীর্ঘ-প্রশ্বাস অনুভব হচ্ছে' বা 'দীর্ঘ-প্রশ্বাস ফেলছি' জানতে হয়। এর পরিবর্তে যদি আশ্বাস হ্রস্বাকারের হয় তখন অনুভূতিও হ্রস্ব হবে। হ্রস্ব-অনুভূতির সাথে জানতে হয় 'হ্রস্ব-আশ্বাস অনুভূতি হচ্ছে' বা 'হ্রস্ব-আশ্বাস নিচ্ছি।' হ্রস্ব-প্রশ্বাস কালে অনুভূতি হ্রস্ব হবে। হ্রস্ব-অনুভবের সাথে সাধককে জানতে হয় 'হ্রস্ব-অনুভব হচ্ছে' বা 'হ্রস্ব-প্রশ্বাস ত্যাগ করছি।' এর পর সাধক আশ্বাস-প্রশ্বাস কালে সর্ব-কায়-প্রতিসংবেদী হয়ে বিহার করার শিক্ষা-গ্রহণ করে।

উপক - ভন্তে, এই সর্ব-কায়-প্রতিসংবেদী হয়ে বিহার করার অর্থ পরিষ্কার হল না।

বুদ্ধ - সর্ব-কায়-প্রতিসংবেদী হয়ে বিহার করার ব্যাপারটি অতি সূক্ষ্ম। তুমি সেটা এখন বুঝবে না। বুঝতে চাইলেও মর্ম উদ্ধার করতে পারবে না। নানা ধরণের প্রশ্ন জাগবে। মন চঞ্চল হবে। হিতে অহিত হবে। অতএব বিস্তার বর্জন করে সংক্ষেপে বলি। আনাপান-স্মৃতি-উপস্থান ভাবনার প্রারম্ভিক অবস্থায় সাধক নাসিকাগ্রের অনুভূতির অনুবেক্ষণ করে। নিয়মিত স্মৃতি-চর্চার পরিণামে সাধক প্রশ্বাসের শ্বাসনলী হয়ে হৃদয় ও হৃদয় হতে নাভি-স্থলে স্পর্শজনিত অনুভূতি এবং তদনুরূপভাবে নাভিস্থল হতে হৃদয় এবং হৃদয় হতে শ্বাসনলী হয়ে নাসিকাগ্রে প্রশ্বাস-আগমনের স্পর্শ-জনিত অনুভূতি অনুভব

করে। কিন্তু নিয়মিত ও ততোধিক সূক্ষ্ম স্মৃতি-সাধনার পরিণামে সাধক আশ্বাস-গ্রহণ ও প্রশ্বাস-ত্যাগ কালে সর্বশরীরে এক অদ্ভূত রোমাঞ্চকর অনুভূতি অনুভব করে। আশ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবেগের হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে এই রোমাঞ্চকর অনুভূতিরও তারতম্য ঘটে। আশ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সারা শরীরময় এই রোমাঞ্চকর অনুভূতির পূঙ্খানুপুঙ্খ অনুভবকে বলা হয় 'সর্ব-কায়- প্রতিসংবেদী হয়ে বিহার করা'। স্মৃতি-সাধনার প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে সূক্ষ্ম ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে যাবে। এর পর সাধক কায়-সংস্কার প্রশান্তিকর আশ্বাস-গ্রহণ এবং কায়-সংস্কার প্রশান্তিকর প্রশ্বাস ত্যাগ করব- শিক্ষা গ্রহণ করে।

উপক - এভাবে একজন সাধক ক্রমান্বয়ে কতক্ষণ বসে থাকতে পারে? ক্রমান্বয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকার পর সাধকের মনে কি উদ্বিগ্নতা উৎপন্ন হয় না।

বুদ্ধ - স্মৃতি-সাধনায় অভ্যস্ত সাধক ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন নড়াচড়া না করেও বসে থাকতে পারে। এতে তার চিত্ত-চাঞ্চল্যতা বৃদ্ধি পায় না, বরংচ চিত্ত-চাঞ্চল্যতা কমে যায়। কিন্তু অনভ্যস্ত স্মৃতি-সাধকের পক্ষে বেশীক্ষণ বসা নিষেধ। কারণ অনভ্যাসের কারণে অধিককাল বসা অবস্থায় থাকলে চিত্ত-চাঞ্চল্য বাড়ে। অপ্রিয় ও অসহ্য শারীরিক ব্যথা-বেদনার সৃষ্টি হয়। আমি নিজে মধ্যম-পন্থী। আমার অনুগামীগণকেও মধ্যম-পন্থী হবার পরামর্শ দিয়ে থাকি।

উপক - অনেকক্ষণ বসে স্মৃতি-সাধনা করার পর অধৈর্য হয়ে গেলে আপনি সাধককে কি করার উপদেশ দেন?

বুদ্ধ - মানুষেরা তাদের নিজ নিজ দেহকে চার অবস্থায় ধারণ করে। চার অবস্থা বলতে- চলা, দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থাকে বোঝায়। এদের এক একটিকে বলা হয়- ইর্যাপথ। এভাবে মানুষের জীবন

কখনও চলা অবস্থায়, কখনও দাঁড়ানো অবস্থায়, কখনও বা বসাবস্থায়, আর কখনও বা শোয়া অবস্থায় কাটে। মোটামুটিভাবে বলা যায় মানবের জীবন চার ইর্যাপথময়। এদের কোন একটিতে অধিককাল ক্ষেপন করলেই মন অধৈর্য হয়, বিরক্তিভাব আসে। শেষে মন চঞ্চল হয়। পুরাতন ইর্যাপথ ত্যাগ করে সাধক নতুন ইর্যাপথ গ্রহণ করে। পুরাতন ছেড়ে নতুন ইর্যাপথ গ্রহণ করলে আরাম পাওয়া যায়। অধৈর্যভাব কাটে। তদ্‌স্থলে স্ফূর্তিভাব জাগে। আবার এই ইর্যাপথেও অধিককাল কাটালে পূর্ববৎ মনোদশার উৎপত্তি হয়। এভাবে বার বার ইর্যাপথ পরিবর্তনের মাধ্যমে মানবের জীবন কেটে যায়। বসাবস্থায় অধিককাল স্মৃতি-সাধনায় কাটালে বিরক্তিভাব কাটানোর উদ্দেশ্যে, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নিয়মিত রক্ত-সঞ্চালন প্রক্রিয়া প্রবহমান রাখার উদ্দেশ্যে, স্মৃতি, স্ফূর্তি ও সজীবতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ঐ ইর্যাপথ ত্যাগ করে অন্য ইর্যাপথ গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়।

উপক - শোয়া-অবস্থায়ও কি স্মৃতি-সাধনা সম্ভব?

বুদ্ধ - হ্যাঁ, সম্ভব। তবে প্রাথমিক অবস্থায় সাধককে অধিককাল শোয়া-অবস্থায় কাটানোর পরামর্শ দেওয়া হয় না।

উপক - কেন?

বুদ্ধ - এতে আলস্য ও তন্দ্রা দুইই বৃদ্ধি পায়। এরা সাধকের বাধক ধর্ম।

উপক - তবে কি সাধকেরা মোটেই শোয় না?

বুদ্ধ - শোয়। তবে সাধারণ মানুষের মত নয়। সাধারণ মানুষের ঘুমে অযথা কাল-ক্ষয় হয়। নিদ্রা ও তন্দ্রা প্রমত্ততা-বর্দ্ধক। প্রমত্ততা মৃত্যুতুল্য। এক কথায় বলা হয় নিদ্রামগ্ন প্রাণী অর্দ্ধমৃত-তুল্য। স্মৃতি-

সাধকেরা জাগ্রত পুরুষ। সদা সতর্ক থাকা, অপ্রমত্ত থাকা তাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য স্বভাবে পরিণত হয়। অপ্রমত্ততাই অমৃতপদতুল্য। এ কারণে স্মৃতি-সাধকগণ শয়ন-ইর্যাপথে কালক্ষয় কম করে ন্যূনতম কাল-যাপন করে। অন্য তিন ইর্যাপথে তারা শয়ন-ইর্যাপথ অপেক্ষা অধিক সময় ব্যয় করে থাকেন।

উপক - সাধারণ মানুষের মধ্যে এক রাত ঘুম না হলেই নানারকম (রোগের) উপসর্গ দেখা দেয়। কাজেই আমার মনে হয় সুস্থ স্বাস্থ্য ধারণের জন্যে ঘুম নিতান্তই আবশ্যক।

বুদ্ধ - সাধারণ মানুষের বেলায় তোমার এমত প্রয়োজ্য। স্মৃতি-সাধকের বেলায় তা প্রয়োজ্য নয়। আমাদের স্মৃতি-সাধকগণের মধ্যে এমন অনেক স্মৃতি-সাধকও রয়েছেন যারা কেবল কয়েকদিন নয়, ক্রমাগত কয়েকবছর ঘুমোন নি। এমন কি শয্যাশায়ীও হন নি। না ঘুমোনোর দরুণ তাঁদের শরীরে কোন প্রকারের দুর্বলতা, অশান্তি বা রোগ দেখা যায় না। বরংচ তাঁরা সাধারণ মানুষের তুলনায় অধিক সুস্থ, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ আয়ুর অধিকারী হন।

উপক - আশ্চর্য, আশ্চর্য। এ সাধনাও চমৎকারিক বড়ই দুষ্কর।

বুদ্ধ - এসব কারণে সাধকের স্মৃতি-সাধনায় যাতে কোন প্রকারের ব্যাঘাত না ঘটে তজ্জন্যে 'চংক্রমন' করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

উপক - ভন্তে, 'চংক্রমন' কাকে বলে?

বুদ্ধ - হাঁটাকে বা পায়চারী করাকে 'চংক্রমন' বলা হয়। তবে এ হাঁটা সাধারণ মানুষের হাঁটা নয়।

উপক - সাধকেরা কি তবে অন্যভাবে হাঁটেন?

বুদ্ধ - সাধকেরাও সামান্য মানুষের মতো দু'পায়ে হাঁটেন। প্রথম প্রথম

দেখলে সাধকদের হাঁটা আর সামান্যজনের হাঁটায় তেমন কোন পার্থক্য বোঝা যাবে না।

উপক - তা হলে তফাৎ কোথায়?

বুদ্ধ - সামান্য জনের হাঁটায় 'স্মৃতি' থাকে না। সামান্যজন হাঁটে এক জায়গায়, কিন্তু চিন্তা করে আরেক জায়গার কথা। হাঁটার সাথে সে আরও অনেক কাজে জড়িত থাকে। তার কাজে আর চিন্তাধারায় সামঞ্জস্য থাকে না। কিন্তু স্মৃতি-সাধকের হাঁটার বেলায় (চংক্রমনকালে) প্রতি পদক্ষেপ তাঁর চিন্তানুসারে হয়। তার অজান্তে এক পাও পড়ে না। বসা থেকে উঠতে ইচ্ছে হলে- সে স্মৃতি সহকারে উঠে। অর্থাৎ উঠার পূর্বে- 'উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে, উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে' চিন্তে করে উঠার পূর্ব-প্রস্তুতি নেয়। এরপর উঠার সময় 'উঠছি', উঠছি' বলে জানে। অর্থাৎ স্মৃতি-সাধনা করে। উঠার পর দাঁড়াবার ইচ্ছে হলে- 'দাঁড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে, দাঁড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে' বলে জানে। এভাবে স্মৃতি-সাধনা করে দাঁড়াবার পূর্ব-প্রস্তুতি নেয়। এর পর দাঁড়ায়। দাঁড়ালে 'দাঁড়ালাম, দাঁড়ালাম' বলে জানে।

এরপর চলতে ইচ্ছে হলে 'চলতে ইচ্ছে হচ্ছে, চলতে ইচ্ছে হচ্ছে' জানে। 'ইচ্ছা জানাটা'ই হচ্ছে স্মৃতি। প্রতিটি ইচ্ছাকে জানা, এবং তন্মধ্যে যতটুকু বাচসিক কর্মে বা কায়িক কর্মে রূপায়িত করা সম্ভব তা স্মরণ করে (জেনে জেনে) সম্পাদন করাই বা তদনুসারে রূপায়িত কায়িক ও বাচসিক কর্ম-জনিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন ও তজ্জনিত অনুভূতির-স্মৃতি সহকারে প্রত্যবেক্ষণ করারই অপর নাম স্মৃতি-সাধনা।

চলাকালে 'চলছি', 'চলছি' স্মৃতি রেখে কায়কর্ম ও মানসিক কর্মের সামঞ্জস্যতা রক্ষা করতে হয়। পা তোলার সময় 'তুলছি, পা নেয়ার

সময় 'নিচ্ছি', আর পা ফেলার সময় 'ফেলছি' বলে স্মৃতি-রক্ষা করতে হয়। সম্মুখে কোন বাধা থাকলে সাধককে দাঁড়াতে হয়। দাঁড়াবার পূর্বে দাঁড়াবার ইচ্ছে হয়। দাঁড়াবার ইচ্ছে হলে 'দাঁড়াবার ইচ্ছে হচ্ছে' জানতে হয়। দাঁড়ালে 'দাঁড়ালাম' 'দাঁড়ালাম' জানতে হয়। পেছন ফিরতে হলে প্রথমে মনেতে ইচ্ছে উৎপন্ন হয়। ইচ্ছে উৎপন্ন হলে 'পেছন ফেরবার ইচ্ছে হচ্ছে' স্মৃতি করতে হয়। এভাবে ক্রমান্বয়ে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্মৃতি-সহকারে পায়চারী করাকে আমাদের সঙ্ঘে 'চংক্রমন' বলা হয়। এবার নিশ্চয়ই বুঝেছো- পায়চারী আর চঙ্ক্রমন-এর তফাৎটা কোথায়।

উপক - বুঝলাম, ভন্তে। খুব ভাল করে বুঝলাম। কিন্তু একটা কথা এখনও জিজ্ঞাস্য রয়েছে।

বুদ্ধ - জিজ্ঞাস্য থাকলে তা নিঃসঙ্কোচে জিজ্ঞেস কর।

উপক - বসা অবস্থায় আশ্বাস-প্রশ্বাসকে আলম্বন করে 'স্মৃতি-সাধনা' করা হয়। কিন্তু চঙ্ক্রমন করার সময় আশ্বাস-প্রশ্বাসকে আলম্বন করা হয় না কেন?

বুদ্ধ - উপক, প্রশ্নটা তোমার বড়ই জ্ঞানের। বসা অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যতীত আর কোন মুখ্য কাজে মন ব্যস্ত থাকে না। মানসিক চিন্তার বিষয়কে স্মৃতি-সাধনার আলম্বন করা প্রাথমিক অবস্থায় দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এ কারণে আশ্বাস-প্রশ্বাসকেই স্মৃতি-সাধনার আলম্বন হিসেবে গ্রহণ করা হয়। কারণ আশ্বাস-প্রশ্বাসই তখন সাধকের মুখ্য কর্ম হয়। চঙ্ক্রমন-কালে আশ্বাস-প্রশ্বাসের চেয়ে পা তোলা, পা নেয়া, পা ফেলা আদি শারীরিক কর্ম অধিকতর স্থূল ও মুখ্য কর্ম হওয়ায় 'চঙ্ক্রমন'-জনিত কায়িক কর্মকে স্মৃতি-সাধনার আলম্বন হিসেবে প্রয়োগ করা হয়।

উপক - ভন্তে ভগবান, বুঝেছি অযথা দীর্ঘকাল কাটিয়েছি। কালের অপচয় আর করব না। আপনি আমার আধ্যাত্মিক অন্তর্যাত্রার পথপ্রদর্শক হউন। আচার্য হউন। আশীর্বাদ দিন যেন আমার প্রয়াস বিফল না হয়।

বুদ্ধ - তোমার মনোবাঞ্ছা শীঘ্রই পূর্ণ হউক। প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা নিতে তৈরী আছো কি?

উপক - হ্যাঁ ভগবান, আমি তৈরী।

বুদ্ধ কোন এক বয়স্ক ও অভিজ্ঞ মহাস্থবিরকে আদেশ দেন উপককে উপসম্পদা-দানের ব্যবস্থা করে দিতে।

শাস্তা তথাগতের আদেশে উপকের উপসম্পদালাভের পথ প্রশস্ত হয়। উপক ভিক্ষুরূপে দীক্ষা লাভ করেন।

উপক বুদ্ধ-প্রমুখ আচার্য-উপাধ্যায়গণের প্রত্যেকের সম্মুখে গিয়ে বন্দনা করে কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। সব শেষে শাস্তার আশীর্বাদ নিয়ে পাশের এক নির্জন এলাকায় যান উপক। সাধনার প্রক্রিয়ায় অনভ্যস্ত থাকায় তিনি এক নাগাড়ে ধ্যানস্থ থাকার ব্যাপারে নিজেকে তৈরী করতে পারেন নি প্রথমে। এক একটি পর্যায়ের প্রস্তুতি নিয়ে সাধনা-জগতে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

কখন তিনি পদ্মাসনে, আবার কখন অর্দ্ধ-পদ্মাসনে (সুখাসনে) বসে অধিককাল কাটানোর অর্থাৎ আসনসিদ্ধি লাভের অভ্যাস করেন। কিছুদিনের অভ্যাসে তিনি আসনসিদ্ধি লাভ করেন। আসন-সিদ্ধি লাভের পর তিনি এবার নাসিকাগ্রে স্মৃতি-উপস্থাপনের কাজে রত হন। অতীতের পুণ্য-সংস্কারে হউক বা শাস্তার পুণ্য-প্রতাপে এ- কাজেও তিনি সিদ্ধ-হস্ত হন।

গৃহী-জীবনে অধিককাল তাঁর শ্বশুরের সাথে বনে-জঙ্গলে কাটালেও একাকী কাল কাটানোর, বিশেষত একা রাত-কাটানোর অভ্যাস তাঁর মোটেই ছিল না। বরংচ নির্জনবাসের ভয় তাঁর ছিল। এখানে ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন পর নির্জনবাসের ভয় তাঁর কিছুটা কমে। ক্রমে বিহারের প্রাত্যহিক কর্মের সাথেও ভিক্ষু উপক ধীরে ধীরে পরিচিত হতে থাকেন। প্রাত্যহিক কর্ম সেরে অবসর সময়ের অধিকটাই স্মৃতি-সাধনার অভ্যাসে তিনি নিয়মিতভাবে কাটান।

'আনাপানা'য় স্মৃতি-সংযোগ করে তাঁর অন্তর্যাত্রার শুভারম্ভ হয়। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পূর্বে অননুভূত অনুভূতির বিচিত্র অনুভব হয়। জিজ্ঞাসা জাগে তাঁর অন্তরে- এ সব অনুভূতি তো তাঁর পূর্বে কখনও হয় নি। 'ঐ উপক' আর 'এই উপক'এর মধ্যে কি তাহলে কিছু পরিবর্তন এসেছে? মাত্র কয়েকদিনের ধ্যানে যদি এই পরিবর্তন হয়ে থাকে তবে যাঁরা জীবনের অধিকাংশ সময় এতেই কাটান তাঁদের মানসিক স্তরের মান নিশ্চয়ই অনেক উন্নত-মানের হবে। লোকমুখে মারের কথা শুনেছি। এই কি সে মার? এই কি ঐ মার-বন্ধন? না সত্যের প্রত্যক্ষ দর্শন? এখন কেন এসবের উৎপত্তি হচ্ছে? পূর্বে কেন হয় নি? ধ্যানানুশীলন-কালে কেন কান-ফাটানো তীক্ষ্ণ শব্দ শোনা গেল। গৃহী-জীবনে থাকতে দিনের বেশ কিছু সময় বনে জঙ্গলে তাঁকে কাটাতে হতো শিকারের উদ্দেশ্যে। তখন কত রকমের বন্য জন্তু-জানোয়ারের আর কত রকমের পশুপাখীর ডাক তিনি শুনেছেন। কিন্তু আজকের নির্জন-বাসে স্মৃতি-সাধনা-কালে শোনা শব্দ ছিল অত্যন্ত অদ্ভূত। একেবারে নতুন ধরণের। এমন নির্জন এলাকায় এমন শব্দ আসবে কোত্থেকে? সন্দেহ হয়- তিনি কি তাঁর নিজের বাছা জায়গায় রয়েছেন, না অন্য কোথাও। সন্দেহ দুর করার উদ্দেশ্যে সবশেষে তিনি চোখ মেলে ফেলেন। চোখ মেলে ভাল করে এদিক ওদিক

দেখেন- কাছে কোন ঘন বন-জঙ্গল নেই।

জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা জাগে একে একে। 'পরে শাস্তার কাছ হতে বা আচার্য-উপাচার্যের কাছ হতে জেনে নেবেন' ভেবে এ জিজ্ঞাসাকে তৎকাল আর বেশী গুরুত্ব না দিয়ে আবার তিনি আশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ও আকারে স্মৃতি-উপস্থাপন করেন। ছোট আকারের আশ্বাস নেবার কালে 'ছোট আশ্বাস নিচ্ছি' জানতে থাকে। লম্বা-আশ্বাস নেবার কালে 'লম্বা-আশ্বাস নিচ্ছি' জানতে থাকে। আবার লম্বাকারের প্রশ্বাস ছাড়ার কালে 'লম্বা আকারের প্রশ্বাস ছাড়ছি' তা জানার কাজে স্মৃতি করতে থাকেন। খানিকক্ষণ তিনি আশ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়ায় সজাগ থাকেন। আবার মূহুর্তেই তিনি আশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ও আকার জানার কাজ ভুলে গিয়ে অন্য কাজে রত হন। এ ভুলটা কি তিনি নিজে করেন, না অন্য কেহ করায়? - প্রশ্নটা তাঁকে বার বার বিব্রত করে তোলে। কখন চাঁপা, চামেলি, জুঁই আদি নানা ফুলের সুগন্ধে, আবার কখনও অসহনীয় দুর্গন্ধে মন ধাবিত হয়। আবার কখনও কারও মধুর ধ্বনিতে মন মোহিত হয়, আবার কখনও বিকট কটু স্বরে মন ভীত-ত্রস্ত হয়। আবার কখন স্মৃতি-সাধনা কাল কাল্পনিক মধুর রস্বাদানে কেটে যায়। আবার কখনও নানা প্রকারের কোমল সুখ-স্পর্শের অনুভূতিতে তিনি স্মৃতি-সাধনার কথা একেবারে ভুলে যান। আশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ আপন অবাধ গতিতে চলে। চিত্ত-চাঞ্চল্যতার কাজও অবাধ গতিতে চলে। এ দু'য়ের মধ্যে যেন কোন সম্বন্ধই নেই। তিনি ভাবতে থাকেন- কাজ করার ছিল কিছু, বাস্তবে করছি অন্য কিছু। কেন এমন হয়? নিজের ইচ্ছাধীনে স্মৃতি-সাধনা হয় না কেন? আবার একের পর এক জিজ্ঞাসার ধারা-প্রবাহ বয়ে চলে মনগঙ্গায়। আবার আশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ও আকারে মনোনিবেশ করেন তিনি। এবার নতুন উদ্যমে আবার স্মৃতি-সাধনার অনুশীলন

করার প্রয়াস করেন। এবার স্মৃতি পূর্বাপেক্ষা বেশ কিছুক্ষণ ভালভাবেই হয়। এভাবে স্মৃতি-সাধনা-কালে হাতে, পায়ে আর গায়ে চুলকানি দেখা দেয়। চুলকানির মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় স্মৃতি বিঘ্নিত হয়। আশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ও আকার হতে স্মৃতি সরে গিয়ে চুলকানির স্থানে যায়। হাতে, পায়ে আর গায়ে একত্রে চুলকানি হওয়ায় আবার স্মৃতি বিঘ্নিত হয়। কখনও হাতের চুলকানিতে, কখনও পায়ের চুলকানিতে, আবার কখনও গায়ের চুলকানিতে স্মৃতি যাওয়ায় মন চঞ্চল হয়। তাঁর যা মূল কাজ ছিল তা তিনি ভুলে যান।

আবার আশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ও আকারে স্মৃতি নিবেশ করেন। কিছুক্ষণ স্মৃতি-সাধনা অভ্যাস করেন। চলাকালে পিঠে সুরসুরি শুরু হয়। মন এবার সুরসুরিতে যায়। হাসিও পায়। কোন প্রকারে হাসি দমিয়ে রাখলেও সুরসুরি দমাতে পারেন নি তিনি। সুরসুরি কখনও কানে হয়। সুরসুরি কখন নাকের ডগায় হয়। সুরসুরিতে মন না দিয়ে উপক পারেন না। মন কখন এখানে, কখনও ওখানে যায়। স্মৃতিকে ফাঁকি দিয়ে মন কখন যে চলে যায় তা তাঁর জানা হয় না। আশ্বাস-প্রশ্বাসে স্মৃতি জাগ্রত করা হয়। আশ্চর্যের বিষয় কিছুক্ষণ স্মৃতি-সাধনা করতে না করতেই উপকের জানা হয় তাঁর হাতের আঙ্গুলে জ্বালা-যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। ক্রমশ সেই জ্বালা-যন্ত্রণার মাত্রা তীব্রতর হতে থাকে। আর তা অসহনীয় হয়ে পড়ে। ঐ অসহনীয় জ্বালা-যন্ত্রণার ফাঁকে মনে জিজ্ঞাসা জাগে- ঐ জ্বালা-যন্ত্রণা শুরু হল কিভাবে? প্রতিটি ঘটনার সূত্রপাত কোথাও না কোথাও কোন না কোন সময় আরম্ভ হয়। উপক নিজেকে জিজ্ঞাসা করে- এর শুরুটা কিভাবে হল তা জানা হল না কেন? নিশ্চয়ই স্মৃতি-সাধনা কোথাও না কোথাও ত্রুটি হয়েছে বা হচ্ছে। জ্বালা-যন্ত্রণা যে বেড়েই চলেছে। এমন মনে হচ্ছিল- কেহ যেন লাল লংকার লেপ লাগিয়ে দিয়েছে। অনেক চিন্তা ভাবনার পর

তিনি ঠিক করলেন এর জ্বালা-যন্ত্রণার মাত্রা কতটুকু বাড়ে একটু দেখতে হবে। জ্বালা-যন্ত্রণাকেই আলম্বন করে তিনি স্মৃতি-সাধনা করতে থাকেন। 'জ্বালা হচ্ছে' জ্বালা হচ্ছে' বলে তিনি স্মৃতি করেন। জ্বালা-যন্ত্রণার থামার নাম নেই। 'জ্বালা হচ্ছে, জ্বালা হচ্ছে, জ্বালা হচ্ছে, জ্বালা হচ্ছে, জ্বালা, জ্বালা জ্বালা' স্মৃতি করছিলেন তিনি। হঠাৎ তাঁর অনুভব হল শীতলতা অনুভব হচ্ছে। এতে তাঁর মনে জিজ্ঞাসা জাগে 'জ্বালা' এল কোত্থেকে? আবার গেলই বা কোথায়? জ্বালার জ্বালা উড়ে গিয়ে শীতলতা এল কোত্থেকে? শেষে তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন- মনের পরিবর্তনে শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তত্ত্বের পরিবর্তন হয়। শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনে বা অসঞ্চালনে শারীরিক তত্ত্বে নানা ধরণের পরিবর্তন হয়। এসব পরিবর্তন সব সময়ই হয়।

এসবের কিছু মাত্র সাধারণ মানুষের জীবনে অনুভূত হয়। আর শেষ সব অননুভূত থাকে তার জীবনে। কিন্তু সাধকের জীবনে ব্যাপারটা উল্টো হয়। এসব পরিবর্তনের অধিকাংশই স্মৃতি-সাধনার কারণে জানা হয়। অননুভূত অনুভূতির পরিমাণ কম হতে থাকে। স্মৃতি প্রখর হলে শারীরিক মানসিক পরিবর্তনগুলো স্পষ্টতর হতে থাকে। এর কারণেই কখনও জ্বালা-যন্ত্রণার অনুভব হয়। আবার কখন শীতলতার বা অন্য নানা ধরণের অনুভূতির অনুভব হয়। মন অন্য কোন আলম্বনে যুক্ত থাকলে ক্রিয়া-শীল পরিবর্তনগুলোও তা হতে উৎপন্ন অনুভূতি গৌণ হয়ে পড়ে। সবই স্মৃতির খেলা। উপকের জানা হয়। স্মৃতি-সাধনার মাধ্যমে শারীরিক মানসিক পরিবর্তন-জাত অনুভবের অনুভূতি ভাল-ভাবে হয়। পরিণামে তা জানা হয়। এই জানাটিই জ্ঞান। না জানাটাই অজ্ঞানতার লক্ষণ। বাস্তবিক অবস্থার জ্ঞানের মাত্রা বাড়ে কমে। মানুষে মানুষের ভেদে জ্ঞানের মাত্রার ভেদ থাকে। এ জ্ঞানের

মাত্রা বাড়াতে হবে। আর তা সম্ভব হয় কেবল স্মৃতি-সাধনার মাধ্যমে। যার যত বেশী স্মৃতি তার জ্ঞানের মাত্রা তত বেশী।

এত সব চিন্তা-ভাবনার পর পুনরায় সে 'আনাপানা'তে ফিরে আসে। আনাপানায় মনোনিবেশ করে। 'আশ্বাস নিচ্ছি' বা 'প্রশ্বাস ফেলছি' জানতে থাকে। ছোট আশ্বাস নেবার সময় 'ছোট আশ্বাস নিচ্ছি' আর লম্বা আশ্বাস নেবার কালে 'লম্বা আশ্বাস নিচ্ছি' বলে জানতে থাকে। ছোট প্রশ্বাস ছাড়ার সময় 'ছোট প্রশ্বাস ছাড়ছি' আর লম্বা প্রশ্বাস ছাড়ার সময় 'লম্বা প্রশ্বাস ছাড়ছি' জানতে থাকে এভাবে তার স্মৃতি-সাধনা চলতে থাকে। এমন অবস্থায় তার মনে হল কিছু যেন ছায়ার মতো সে দেখতে পাচ্ছে। ক্রমশ ছায়া ছবির মতো স্পষ্ট হয়। ক্রমশ তা আর ছবি হয়ে থাকে নি। তা জ্যান্ত-জীবন্ত মানব-পুত্রের ন্যায় হয়ে পড়ে। শেষে তা যে রূপধারণ করে তা দেখে উপক অবাক না হয়ে থাকতে পারেন নি। কারণ এ মানব-পুত্রের রূপ আর কারও নয়, তা তার পুত্র সুভদ্রেরই ছিল। ফেলে আসা সুভদ্রের আদুরে মুখখানা আগ্রহ ভরে দেখেন, আর দেখতেই থাকেন। আনাপান -এর কথা, স্মৃতি-সাধনার কথা তিনি ভুলেই যান। তিনি যে শ্রাবস্তীতে শাস্তার সান্নিধ্যে জেতবন-আরামের একটি কুটিতে বসে ধ্যান করছেন সে কথাও যেন তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। সব ভুলে গিয়ে তিনি সুভদ্রকে ভাল ভাবে দেখতে থাকেন। কতক্ষণ দেখেছেন তা তাঁর জানা নেই। হঠাৎ তাঁর মোহভঙ্গ হয়। তিনি কি ঘুমিয়ে ছিলেন? তিনি কি তাঁর ছেলে সুভদ্রকে স্বপ্নে দেখেছেন, না জাগ্রত অবস্থায়? একের পর এক জিজ্ঞাসা জাগে। জিজ্ঞাসার ধারা-প্রবাহকে কোন প্রকারে থামিয়ে একটি প্রশ্নে কেন্দ্রীভূত করেন।

উপক তাঁর গৃহী-জীবনে এমন কি বাল্যজীবনেও শুনেছিলেন যে মানুষ তন্দ্রাবস্থায় অনুভূত বা অননুভূত দৃষ্ট বা অদৃষ্ট অনেক কিছুরই স্বপ্ন

দেখে। তবে জাগ্রত অবস্থায় যে এধরণের ঘটনা ঘটে তা তাঁর মোটেই জানা ছিল না। তিনি তো ঘুমিয়ে ছিলেন না। তিনি তো পদ্মাসনে বসে ধ্যানানুশীলন করছিলেন। তিনি তো নানা ধরণের অনুভূতির অনুভব করছিলেন। সজ্ঞানে স্মৃতি-সাধনার মাধ্যমেই তিনি সে-সবের অনুভব করেছিলেন। কাউকে একথা বললে তিনি কি তা বিশ্বাস করবেন। কাকেই বা তিনি এসব কথা বলবেন? অনন্তজিন ছাড়া তাঁর যে আর জানা-শোনা কোন মানুষ নেই এখানে। তিনি হয়ত এখন ধ্যানস্থ আছেন। এত রাতে তাঁকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। হয়ত তাঁর ভিক্ষু শিষ্য-অনুশিষ্যগণ এত গভীর রাতে তাকে প্রবেশের অনুমতিও দেবে না। শেষে তিনি সিদ্ধান্ত নেন আগামীকাল প্রাতরাশের পর অনন্ত জিনের কাছে যাবেন। সব কথা খুলে বলবেন। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেবে ভেবে তিনি শুয়ে পড়েন। চোখের পাতাগুলো লেগেছে মাত্র। তন্দ্রা আসে আসে- ভাব । বাস্তব জগতের কথা সব তিনি ভুলে গেছেন। খানিকক্ষণ পর তাঁর মনে হল সুরূপা চাঁপা তাঁর পাশে এসে বসে আছে। মান-অভিমান ছেড়ে সে যেন তাঁকে অনুনয়-বিনয় করছে। আরও কত কিছু তিনি দেখেছেন। সব তার মনে পড়ছে না। তবে চাঁপার রমণীয় চেহারাটা স্পষ্ট মনে পড়ছে। এসব ভাবতে ভাবতেই উপকের ঘুম ভেঙ্গে যায়।

জানালা খুলে দেখতে পেলেন রাত শেষে ভোর প্রায় হয় হয়। তিনি নিজ বাসস্থান, বিহার, প্রাঙ্গন, চৈত্যাদি পরিষ্কার করেন। অন্যান্য ভিক্ষু-শ্রামণেরগণ নিজ নিজ এলাকা পরিষ্কার করেন। এসব কাজ সূর্যোদয়ের সাথেই সাথেই হয়ে যায়। আবাসিক ভিক্ষু-শ্রামণেরগণ অন্নে পরিপূর্ণ ভিক্ষাপাত্র হাতে পাশের গ্রাম হতে ফিরে আসছেন। আর কেহ প্রাতঃরাশ পরিবেশনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। উপকও এ কাজে সহায়কের ভূমিকা পালন করল। এত ভিক্ষু-শ্রামণের আসছে, যাচ্ছে,

উঠছে আর বসছে। এছাড়া পাশের গ্রাম হতেও ভক্তবৃন্দরা ফল-ফুল, ধূপ-দীপ, অন্ন-ব্যঞ্জনাদি নিয়ে আসছে সারিবদ্ধভাবে। কোথাও হৈ চৈ নেই। অবাক পানে চেয়ে থাকে উপক। উপকও নিজেকে সেভাবে ঢালতে চেষ্টা করে। অতি সন্তর্পণে তিনি ওকাজে লিপ্ত হন। বয়স্ক ভিক্ষুগণ এসে এক জায়গায় এসে বসেন। কনিষ্ঠ ভিক্ষুগণ আরেক জায়গায় বসেন। নতুন শিক্ষার্থী শ্রামণেরগণ আরেক জায়গায় বসেন। কিছু অভিজ্ঞ ভিক্ষু-শ্রামণের সবার প্রাতঃরাশ পরিবেশনের ব্যবস্থাপনায় রত হন। আর সবাই প্রাতঃরাশ গ্রহণে রত হন।

প্রাতরাশ গ্রহণের বিধি-বিধান দেখে উপক আবারও অবাক হন। কয়েকজন বাদে ভিক্ষু-শ্রামণেরগণের অধিকাংশই নিস্তব্দে প্রাতঃরাশ গ্রহণ করেন। প্রাতঃরাশ গ্রহণের প্রক্রিয়ায় কোন স্তরে কোন প্রকারের তাড়াহুড়ো তাঁরা দেখান না। গ্রাসের পিণ্ড তৈরী করা, গ্রাস ধরা, গ্রাস তোলা, মুখে পিণ্ড ঠেলে দেওয়া, অন্ন চাবানো, অন্ন গেলা ইত্যাদি প্রত্যেকটি স্তরে মনে হয় কি যেন আওড়ান তাঁরা। খাওয়াটা যেন প্রধান কাজ নয়, খাওয়ার বাহানায় কিছু যেন আওড়ান তাঁরা। সব ক্ষেত্রেই যেন একটা তীক্ষ্ণ নজর রয়েছে। অতি সন্তর্পনে অত্যন্ত গোপনে। তাঁরা প্রত্যেকে যেন খাবারের রসাস্বাদন না করে অন্য কিছুর রসাস্বাদন করছেন অন্যের অগোচরে।

প্রাতরাশের পর নিজ নিজ বাসস্থানে নিজ নিজ কৃত্যে ফিরে যাবার পালা। এ ক্ষেত্রেও সবাই সংযমী ছিলেন। এই কিছুক্ষণ পূর্বে এ স্থানটি ছিল এক জনারণ্য তুল্য। আর এখন হয়ে পড়েছে একেবারে নির্জন এলাকা।

উপক এবার অতি সন্তর্পণে শাস্তার গন্ধকুটিতে প্রবেশ করেন। তিনি প্রহরী ভিক্ষুকে জিজ্ঞেস করেন - 'শাস্তা' আছেন? প্রহরী ভিক্ষু বলেন-

শাস্তা আছেন। তবে অপেক্ষা করুন। প্রহরী ভিক্ষু গর্ভ-প্রকোষ্টে গিয়ে শাস্তাকে উপকের আগমনের সূচনা দেন। তাকে আসতে দেওয়া হবে কিনা জানতে চাইলে নিয়ে আসার অনুমতি দেন শাস্তা। প্রহরী ভিক্ষু উপককে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান। উপক শাস্তার প্রতি নতজানু হয়ে প্রণাম জানান। এর পর তিনি এক প্রান্তে বসে পড়েন।

শাস্তা - কেমন আছো, উপক?

উপক - ভাল আছি।

শাস্তা - প্রাতঃরাশ সেরেছো?

উপক - হ্যাঁ।

শাস্তা - কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি তোমার?

উপক - কিছু নয়, অনেক কিছু রয়েছে জিজ্ঞাসার।

শাস্তা- সংক্ষেপে বল। কি হল তোমার?

উপক - গতকাল আপনার কাছ হতে বিদায় নিয়ে স্মৃতি-চর্চায় রত হই। আনাপানে মনোনিবেশ করি। কিছুক্ষণ পর পরই মন অন্যত্র চলে যায়। কখন যে যায় জানা হয় না। স্মৃতি-সাধনা করা কালে চুলকানি খুজলানিও দেখা দিয়েছিল। জ্বালা-যন্ত্রণাও হয়েছিল পায়ের আঙ্গুলে। আমার এ বয়স অবধি জানা ছিল চোখ বন্ধ করলে কিছু দেখা যায় না। অবশ্য নিদ্রা-তন্দ্রা অবস্থায় দৃশ্য বা স্বপ্ন দেখা যায়। কালও দেখেছি। কিন্তু স্মৃতি-সাধনাকালে অর্থাৎ জাগ্রত-অবস্থায় কাল আমার ছেলে ভদ্রকে দেখেছি। এ রকম ঘটনা কি অন্যান্য সাধক-সাধিকার বেলাতেও ঘটে থাকে, নাকি শুধু আমার বেলাতেই হয়েছে?

শাস্তা - আরোও কি কিছু বলার আছে?

উপক - ছিল অনেক, তবে এখনকার মতো এই আমার জিজ্ঞাস্য।

শাস্তা - এ ধরণের ঘটনা যে শুধু তোমার বেলাতেই হয়েছে তা নয়। অন্যান্য সাধক-সাধিকাগণের প্রারম্ভিক অবস্থায় এসব হয়ে থাকে। বিশেষ দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।

উপক - মন যে এদিক ওদিক চলে যায়?

শাস্তা - মনের স্বভাব। মন যে বানরের মতো। এ চঞ্চল স্বভাবকেই শান্ত করতে হবে।

উপক - মন এদিক ওদিক যায়। কেন যায়? তা বুঝলাম। কিন্তু কখন যে তা ফুরুৎ করে চলে যায় তা তো আমার জানা থাকা দরকার। তা জানা হয় না কেন? প্রশ্ন জাগে বারবার- এ মন আমার, না অন্য কারও?

শাস্তা - তোমার শরীরস্থ মন তোমারই। আর কার হবে? স্মৃতি-সাধনা করেছ বটে, তবে স্মৃতির অভাবে অর্থাৎ তীক্ষ্ণ-স্মৃতির অভাবে মন কখন কোথায় যায় জানা যায় না। এ মন বিদ্যুতের গতির চেয়েও অধিক গতি-শীল। স্মৃতি প্রখর হলেই সব জানা যাবে।

উপক - স্মৃতিকে কি করে প্রখর করতে হবে?

শাস্তা - স্মৃতি-সাধনাকালে মনকে দোলায়মান হতে দেবে না।

উপক - এ দুরন্ত মনকে বাঁধব বা ধরব কি করে?

শাস্তা - এই স্মৃতি দিয়েই মনকে বাঁধতে বা ধরতে হয়। স্মৃতি-সাধকের মননীয় বিষয় হল- এক সময় এক কাজ করা। যখন যা তখন তা- জানা। অর্থাৎ স্মৃতি-সাধনাকালে আশ্বাস-প্রশ্বাসের স্থলে যদি কোন দৃশ্য দেখা যায়, বা কোন শব্দ শোনা যায়, বা অন্য কোন

প্রখর আলম্বন উৎপন্ন হয় তখন ঐ আলম্বনকেই স্মৃতির বিষয় করতে হবে। আশ্বাস-প্রশ্বাসের পরিবর্তে নতুন আলম্বন (বিষয়) কেন উৎপন্ন হল- তা জিজ্ঞেস করবে না বা এ বিষয় নিয়ে দুর্ভাবনাগ্রস্ত হবে না। দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত হলেই কালের অপচয় হয়। বিপথ-গামী হবার সম্ভাবনা থাকে।

উপক - প্রভু, এ সব কথা এর পূর্বে বলেন নি কেন?

শাস্তা - প্রয়োজন ছিল না। নিষ্প্রয়োজনে কোন কথা বলা হলে তা নিরর্থক হয়। বুদ্ধগণ নিরর্থক বাক্য প্রয়োগ করেন না।

উপক - ব্যাপারটা এবার আরও পরিষ্কার হল। প্রভু, এভাবে আমার প্রতি অনুকম্পা-প্রদর্শন করে আজীবন পথপ্রদর্শন করবেন। এই আমার বিনম্র নিবেদন।

শাস্তা - আশীর্বাদ করি নিজ কাজে সফল হও।

উপক শাস্তাকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম জানিয়ে নিজ কুটিতে ফিরে যান। ফিরে যাবার পথে দেখতে পায় আবাসিক ভিক্ষু-শ্রামণেরগণ সারি বেঁধে ভিক্ষাপাত্র হাতে ভিক্ষান্ন-সংগ্রহে বিভিন্ন দিকে এগিয়ে চলেছেন। তাদের চলার প্রক্রিয়াও লক্ষ্য করার মতো। সবাই ধীর মন্থর গতিতে চলছেন। ডানে বায়ে কারো দৃষ্টি যাচ্ছে না। সবার দৃষ্টি পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি হতে প্রায় দু হাত দুরে রয়েছে। কারো মুখে কোন প্রকারের শব্দ নেই। সবাই মৌন ব্রতধারী হয়ে চলেছেন। আহার সংগ্রহের বাহানায় তারা যেন সবাই শান্তির প্রতীক বুদ্ধের শান্তি-দূত হয়ে নগরবাসীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছেন শান্তির বাণী -- ভোগে শান্তি নেই, ত্যাগেই শান্তি। শান্তি বাইরে নেই, শান্তি ভেতরে রয়েছে।

উপক কুটিতে যাবার কালে তাদের চলার প্রক্রিয়ার অনুকরণ করেন।

দুপুরের অন্নগ্রহণের সময় নিকট প্রায়, বেশীক্ষণ ধ্যানে বসা অনুচিত ভেবে বিশ্রামের মুদ্রায় শুয়ে শুয়ে ধ্যানাভ্যাস করতে থাকেন। আনাপানে স্মৃতি-স্থাপন করেন তিনি। কিছুক্ষণ স্মৃতি-সাধনা চলে ওতে। হঠাৎ তার জানা হল আশ্বাস-গ্রহণের (আন) সাথে নাভি উপরে উঠছে। আর প্রশ্বাসের (আপান) সাথে নাভি নামছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন রকমের ব্যতিক্রম তিনি লক্ষ্য করেন নি। নাভির ওঠা-পড়ার প্রক্রিয়ায় স্মৃতি-সাধনা করাটা একটু সরল মনে হওয়ায় উপক শুয়ে শুয়ে নাভির ওঠা-পড়ার প্রক্রিয়ায় স্মৃতি-সাধনা করতে থাকেন। নাভি উঠলে 'উঠছে' জানেন। নাভি পড়লে 'পড়ছে' জানেন। প্রক্রিয়াটা সরল মনে হওয়ায় উপকের মন এতে বেশীক্ষণ নিবিষ্ট হয়।

স্মৃতি কতক্ষণ এতে নির্বাধ গতিতে চলেছিল তা জানা ছিল না উপকের। তবে স্মৃতি-সাধনা-কালে কিছুটা আরাম বা সুখানুভূতি হয়েছিল। হঠাৎ পাশের কোন স্থান হতে কারও পদচাপধ্বনি শুনতে পান তিনি। এর পর তাঁর ধ্যান ভাঙ্গে।

দুপুরের অন্ন-গ্রহণের সময় হয়ে গেছে। ততক্ষণে সবাই সারিবদ্ধভাবে অতি সন্তর্পণে ভোজনশালার দিকে এগিয়ে চলেছেন। উপকও এর মধ্যে হাত মুখ ধুয়ে তৈরী হন। সবার শেষে গিয়ে তাদের পেছনে পেছনে তিনি চলতে থাকেন। অন্ন-গ্রহণের রীতি প্রাতরাশ গ্রহণের ন্যায়। সবাই অতি সন্তর্পণে অন্ন-গ্রহণ করছেন। উপকও দেখাদেখি খাবার খাওয়ার প্রক্রিয়াটাকে মন্থর করেন। সন্তর্পণে তিনিও খাবার খাওয়ার চেষ্টা করতে থাকেন। মাঝে মাঝে ভুল হয়। ভুলে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলেন। নিজেকে তিনি ধিক্কার দেন। অপরে দেখলে কি বলবে? হয়ত বলবে- দেখ, এ নবাগন্তুক কত লোলুপ প্রকৃতির। সংযমতা নেই মোটেই। হঠাৎ তার মনে পড়ল শাস্তা তো নির্দেশ দিয়েছিলেন- এক সময় এক কাজ করতে। আর যখন যা করা হয়

তাতে মনোনিবেশ করতে অর্থাৎ তার স্মৃতি করতে। এর অর্থ হল সাধক-সাধিকা সরাসরি খেতে পারবে না। পিণ্ড-তৈরীর সময় 'পিণ্ড-তৈরী করছি' বলে জানতে হবে। গ্রাস তোলার সময় 'গ্রাস তুলছি' বলে জানতে হবে। মুখে গ্রাস ঠেলে দেবার সময় 'গ্রাস ঠেলে দিচ্ছি' বলে জানতে হবে। চাবানোর সময় 'চাবাচ্ছি, চাবাচ্ছি' বলে জানতে হবে। গেলার সময় 'গিলছি, গিলছি' বলে জানতে হবে। গলনলী দিয়ে খাবার গেলে 'খাবার যাচ্ছে, খাবার যাচ্ছে' জানতে হবে। ঠাণ্ডা বা গরম বা জ্বালা-যন্ত্রণার অনুভব হলে 'ঠাণ্ডা বা গরম বা জ্বালা-যন্ত্রণার অনুভব হচ্ছে' বলে জানতে হবে। কিছুক্ষণ এভাবে স্মৃতি করে খাবার খাওয়ার অভ্যাস করেন উপক। কয়েকবার তিনি কয়েকটি গ্রাস-গ্রহণের প্রক্রিয়া খুবই সতর্কতার সাথে গ্রহণ করেন। এতে তার উপলব্ধি হয়- যদি কোন সাধক-সাধিকা ভাল ভাবে স্মৃতি করতে চায় এই খাওয়ার প্রক্রিয়ায় তা হলে এক গ্রাস ধরা থেকে আরম্ভ করে গ্রাস গেলার প্রক্রিয়াতেই অনেক সময় লাগে। এবার সে বুঝতে পারে অন্যান্য ভিক্ষু-শ্রামণেরগণ এত সন্তর্পণে খান কেন? এভাবে চিন্তন-অনুচিন্তনে ও স্মৃতি-সাধনায় সেদিনের খাবার পালা শেষ হয়।

খাবার শেষে সবাই সারিবদ্ধভাবে অতি সন্তর্পণে নিজ নিজ কুটিতে ফিরে যান। উপকও ফিরে আসেন।

কুটিতে ফিরে এসে উপক কিছুক্ষণ বিরাম নেবার পর স্নানাদি সেরে চিন্তা করেন- এভাবেই কি সময় কাটবে? আবার পরিকল্পনা করেন অন্যেরা কে কিভাবে, আর কতক্ষণ ধ্যান করেন তা দেখার। সন্ধ্যা অবধি তিনি নিজ কুটিতেই ধ্যান করেন। সন্ধ্যা হতেই বিহারের কাঁসার ঘণ্টার মধুর ধ্বনি কানে আসে। নিজ নিজ এলাকার বিহারে আবাসিক ও আগন্তুক ভিক্ষু-শ্রামণের-গণের সামূহিক বন্দনার সময়ের সংকেত এটা। কাঁসার ঘন্টার ধ্বনি শেষ হতে না হতেই আবাসিক ও আগন্তুক

ভিক্ষু-শ্রামণেরগণ বিনয়সম্মতভাবে নিজ নিজ এলাকার বিহারে বা চৈত্যের চারপাশে এসে বসেন। ত্রিরত্ন-বন্দনা করেন। আনন্দ-বোধির বন্দনা করেন। মৈত্রী-সূত্র, মঙ্গল-সূত্র, রত্ন-সূত্রাদির আবৃত্তি সমস্বরে করেন। কিছুক্ষণ সামূহিক ভাবনা করেন সবাই। এরপর একজন বয়োজ্যেষ্ঠ মহাস্থবির ভিক্ষুগণের বিনয়-কর্ম ও প্রাত্যহিক-কর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধর্ম-দেশনা দিয়ে স্বস্থানে ফিরে যান। উপক এক নীরব দর্শক হিসেবে সব দেখেন।

কিছু ভিক্ষু-শ্রামণের সারিবদ্ধভাবে নিজ নিজ কুটির দিকে চলে যান। আর কিছু ভিক্ষু-শ্রামণের সেখানেই পায়চারী করতে থাকেন। আর কিছু ভিক্ষু-শ্রামণের স্বচ্ছন্দে অথচ সন্তর্পণে এদিক ওদিক যান। তাদেরকে এই সন্ধ্যায় এদিক ওদিক যেতে দেখে উপকের মনে- 'এরা কোথায় যান?' জানার উৎকণ্ঠা বেড়ে যায়। তিনিও তাদের কয়েকজনের পেছনে নীরবে যেতে থাকেন যাতে কারো কোন প্রকারের ব্যাঘাত না ঘটে। দেখতে পান -- এদের কেহ বিহারের এক নির্জন প্রান্তে আসন বিছিয়ে ধ্যানাভ্যাসের তৈরী করছেন। আবার এদের কেহ বিহার-প্রাঙ্গনের বৃক্ষমূলে আসন বিছিয়ে ধ্যান-মুদ্রায় আছেন। আর কেহ দুরে একেবারে একান্তে ধ্যানে লীন হয়েছেন। আর কেহ উন্মুক্ত এলাকায় চংক্রমণ (পায়চারী) করছেন। এ সব ঘটনাক্রম দেখে শাস্তার প্রতি, সংঘের প্রতি তার শ্রদ্ধা বাড়ে। তবে এখনও উপকের মনে কিছু শংকা রয়েছে- যারা এই সন্ধ্যাকালে বিহারের সীমা পেরিয়ে গেছেন, তারা কোথায় গেলেন? কেন গেলেন? ইত্যাদি জানার উদগ্রীবতা যেন বেড়েই চলেছে। উপক আর বিলম্ব করেন না। জেতবন বিহারের মুখ্য দরজায় গিয়ে দেখেন সেখানে দ্বারপাল ভিক্ষু ছাড়া আর কেহ নেই। দ্বারপাল ভিক্ষুর কাছে উপক জানতে চান -- এই কিছুক্ষণ পূর্বে কিছু ভন্তে এদিক দিয়ে

বেরিয়েছেন। কোন্ দিকে গেলেন তাঁরা?

দ্বারপাল ভিক্ষু- কিছু এদিকে গেলেন।

নগর-সীমার পরই গ্রামাঞ্চল শুরু হয়। উপক গ্রামাঞ্চলের কাঁচা রাস্তা হয়ে এগোতে থাকেন। কিছুদূর যেতেই উপক দেখতে পেলেন কিছু বাচ্চা এক জায়গায় বসে গল্প-গুজব করছে। উপক তাদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করার পূর্বেই তাদের একজন জিজ্ঞেস করে বসে- আপনিও কি শ্মশানে যাবেন?

উপক - না না, শ্মশানে যাবো কেন? শ্মশানে যাবার সময় হয় নি এখনও।

গ্রামের বাচ্চা- কেন ঐ যে ভন্তেরা গেলেন? ওরা তো রোজই যান।

গ্রামের বাচ্চাদের মুখে ঐ স্থবির-মহাস্থবির ভন্তেগণ শ্মশানে গেছেন এবং তাদের রোজ শ্মশানে যাবার কথা শুনে উপকের আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা দুই বেড়ে যায়। উপকের মনে প্রশ্ন জাগে-- ধ্যান যদি করতে হয় তা তো তাঁরা বিহারের প্রাঙ্গনেই করতে পারেন, সেখানে করলেন না কেন? শ্মশানের নির্জন এলাকা, গ্রাম্য অঞ্চলের নির্জন এলাকা, আর বিহার প্রাঙ্গনের নির্জন এলাকার মধ্যেও কি পার্থক্য রয়েছে? বিহার-প্রাঙ্গনে শতাধিক ভিক্ষু-শ্রামণেরগণ থাকলেও স্মৃতি-সাধনায় থাকার সুবাদে ঐ এলাকা নীরব থাকে। রাতে স্থানীয় ও বহিরাগত আগন্তুকের সংখ্যা মোটেই না থাকায় বিহার-প্রাঙ্গণের নীরবতার মাত্রা থাকে অধিক। জনাকীর্ণতা ও ব্যস্ততার কারণে মাঝরাতের দিকে নীরবতার মাত্রাটা বাড়ে। তবে ঐ নীরবতা যে কখন বিঘ্নিত হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। গ্রামাঞ্চলের রাতের নীরবতা শহরাঞ্চলের রাতের নীরবতা অপেক্ষা মাত্রায় অধিক। শ্মশানের নীরবতা কি তবে শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের নীরবতা অপেক্ষা অধিক ও ভিন্ন? হয়ত

হবে। বাচ্চাদের কাছ হতে শ্মশানে যাবার পথ-নির্দেশনা জেনে নিয়ে ঐ পথে এগোতে থাকেন।

অলিগলি হয়ে উপক এগোন। গ্রামের কুকুরগুলো হঠাৎ অচেনা পুরুষকে দেখে ডেকে ওঠে। মাঝে মধ্যে কোন কোন বাড়ীর দরজা-জানালা দিয়ে তেলের বাতির টিমটিমে আলো দেখা যায়। আর সর্বত্র অন্ধকার। কেহ আবার তাকে চোর ভেবে ফেলে এই শংকায় চলার গতি বাড়িয়ে গলির শেষ মাথায় অর্থাৎ গ্রামের শেষ প্রান্তে কোন প্রকারে পৌঁছোন। বেশ কিছু দুরে আগুন জ্বলতে দেখে উপক সেদিকে পা বাড়ায়। (আগুনের) জ্বলা-ভূমির কাছাকাছি পৌঁছে বুঝতে পারেন সন্ধ্যার প্রাক্কালে বোধ হয় কোন মৃতদেহকে জ্বালিয়ে আত্মীয়-স্বজনরা চলে গেছেন। শ্মশানের আগুনও অল্পক্ষণ পরে নিভে যাবে। ঐ শেষক্ষণের আলোতে এক দুবার যতদুর দেখা যায় দেখে নেবার চেষ্টা করেন উপক। দেখতে পান- বেশ কিছু দুরে দুই কি তিন জন পীতবস্ত্রধারী ধ্যান-মুদ্রায় বসে আছেন। আরও বেশ কিছু দুরে কাউকে একাকী দেখা গেল না। হয়ত কেহ বসে থাকতে পারেন। এঁদেরকে এখানে বসে থাকতে দেখে উপকের মনে শ্মশানে বসে ধ্যান করার আগ্রহ জন্মে। এর পূর্বে দিনের বেলায় কয়েকবার শ্মশানে যাবার তার সুযোগ হয়েছিল, তবে রাতে এই প্রথম। শ্মশানের ব্যাপারে বন্ধু-বান্ধবদের মুখে নানা কথা শুনেছেন। তখন ঐ সব কথায় উপক ততটা গুরুত্ব দেন নি।

তিনি মনে অনেকটা সাহস জুগিয়ে সংকল্প করেন - আজ রাতটা এখানেই তিনি কাটাবেন। অজানা আপদবিপদের কথা ভেবে তিনি যেখানে দুই-তিন জন আশে-পাশে বসে ধ্যান করছেন সেদিকে সন্তর্পনে যান। কোন প্রকারের সাড়া-শব্দ না করে তিনিও একটা আসন বিছিয়ে ধ্যান-মুদ্রায় বসে পড়েন। প্রথমে শাস্তার প্রতি শ্রদ্ধাভরা

প্রণাম জানান। 'আনাপান'-ভাবনায় মনোযোগ দেন। একাগ্রতা বাড়ান। এক সময় এমন আসে যখন তাঁর মনেই হচ্ছিল না তিনি শ্মশানে বসে আছেন।

বেশ ভালই লাগছিল তার সেখানে বসে থাকতে। মাঝে মধ্যে নিশাচর পশুপাখীর ডাক শোনা যাচ্ছিল। সামান্য ভয় পেলেও তা তাঁকে খুব একটা দুশ্চিন্তায় ফেলে নি। কখন কখন চোখ খুলে তিনি দেখেন- ঐ ভিক্ষুরা বসে আছেন কিনা? তাদেরকে নির্বিঘ্নে ধ্যান করতে দেখে তিনি আশ্বস্ত হন। পুনরায় নিজ ধ্যানে মগ্ন হন। এভাবে প্রায় মাঝরাত কাটে।

মাঝে মধ্যে পচা দুর্গন্ধ হঠাৎ কোত্থেকে এসে পরিবেশ দুষিয়ে ফেলে। চোখ খুলে দেখেছে- এতে অন্যেরা কিভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন। তাদেরকে নির্বিকার দেখে উপক সব সয়ে যাবার চেষ্টা করেন।

কখনও তাঁর কানের পাশে ঝি-ঝি পোকার ডাক শোনা যায়। কখনও যেন দুরে কোথাও শেয়ালেরা ডাক দিচ্ছে- তা শুনতে পান। এ সব শুনে শুনে তিনি অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। ভীত-ত্রস্ত হন নি তিনি। আনাপানকালের অনুভূতিকে স্মৃতির সাথে জানার কাজে অধিক সময় ব্যয় করেন।

হঠাৎ এক বিকট অট্টহাসির শব্দ শোনায় তিনি চিন্তাগ্রস্ত হন। এ ধরণের বিকট শব্দ এর পূর্বে তিনি কখনও শোনেন নি। এ শব্দটা কিসের? এ চিন্তায় উপক মগ্ন হয়। এমন বিকট ও ভয়ানক শব্দ মানুষের তো নয়ই। আবার এমন শব্দ কোন হিংস্র পশুরও হতে পারে না। এই চিন্তাই তিনি করতে থাকেন। এ শব্দটা কোন প্রাণীর? দেখতে তা কত বিশাল আকারের? তিনি একবার চোখ মেলেন। এদিক ওদিক তাকান। আশেপাশে কোথাও কোন প্রাণীর নাম নিশানা

নেই। অন্য ভিক্ষুগণের প্রতিও তাকান। তারা নির্বিকার। বাইরের কোন কিছুর প্রতি তাদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

উপক চিন্তা করল- এ বিকট শব্দ যদি কোন পশুর হত তবে তাঁরাও নিশ্চয়ই তা শুনেছেন। কিন্তু এমন অবস্থায় গিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করাটাও সমীচীন নয়। পরে জিজ্ঞেস করবেন ভেবে আবার আনাপানে স্মৃতি-উপস্থাপন করেন।

স্মৃতি-উপস্থাপন-কালে হঠাৎ তার শাস্তার নির্দেশ মনে পড়ে। শাস্তা দেশনাচ্ছলে বলেছিলেন- 'যখন যা, তখন তা' জানা। এক সময় এক কাজ করার। এই হল বিপশ্যনা ভাবনা। উপক ভাবেন আমার কাজ ছিল- 'শুনছি, শুনছি, শুনছি' স্মৃতি করে ঐ বিকট শব্দকে জানা। ঐ শব্দ কোত্থেকে এসেছে বা ওটি কিসের শব্দ- এ সব আবোল-তাবোল চিন্তে করে সময়ের অপচয় করা হয়েছে মাত্র। তা ভেবে আবার স্মৃতি-সাধনায় মনোনিবেশ করেন উপক।

আশ্বাস নিলে 'আশ্বাস নিচ্ছি' আর প্রশ্বাস ফেললে 'প্রশ্বাস ফেলছি' জানতে থাকে। লম্বা আশ্বাস নিলে 'লম্বা আশ্বাস নিচ্ছি' জানে। ছোট আশ্বাস নিলে 'ছোট আশ্বাস নিচ্ছি' জানে। এমন করা হলে হঠাৎ তার মনে হল তিনি যেন এক দীর্ঘাকার আশ্বাস নিচ্ছে। তিনি স্মৃতি করে 'দীর্ঘ-আশ্বাস নিচ্ছি' জানতে থাকে। 'দীর্ঘ আশ্বাস নিচ্ছি, নিচ্ছি, নিচ্ছি আর নিচ্ছি' জেনেই চলেছে। ঐ দীর্ঘ আশ্বাস যেন আর শেষ হয় না।

তাঁর ভয় উৎপন্ন হয়- এ আবার কেমন কথা? আশ্বাস যদি একনাগাড়ে নিতেই থাকি তবে ফেলব কখন। প্রশ্বাস না ফেললে বাঁচব কি করে? আবার সংবেগ ফিরে পায়। উপক ভাবেন এসব আমি কি করছি? আমার তো স্মৃতি করার কথা ছিল। স্মৃতি তো করছি না। এভাবে ঊষাকাল আসে। কাক-পক্ষীর ডাক শোনা যায়। আর এখানে বসা

ঠিক হবে না ভেবে চোখ মেলেন। দেখেন ঐ ভিক্ষুরা চলে গেছেন। শেষে উপকও শ্মশান ত্যাগ করেন।

নিজ কুটিতে ফিরে আসার পর কাপড়-চোপড় ধুয়ে স্নান সারেন। ভিক্ষুগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে সারিবদ্ধভাবে স্মৃতি- সহকারে পরিপূর্ণ ভিক্ষাপাত্র হাতে নিজ নিজ বিহারে ফিরে আসছেন। বিহার, প্রাঙ্গণ, চৈত্যাদি ঝাড় দেবার পর তাঁরা স্নান সারেন। সবাই পরিষ্কার চীবর পড়ে আবার সারিবদ্ধ- ভাবে ভোজন-শালায় আসন গ্রহণ করেন। সবার সাথে তাল মিলিয়ে উপকও আহার-গ্রহণের প্রক্রিয়ায় স্মৃতি-সাধনা করেন।

একদিকে ক্ষিদের জ্বালা। অন্যদিকে স্মৃতির পালা। দুয়ের ঠেলাঠেলি। তবুও ক্ষিধের জ্বালাকে সহ্য করে উপক শান্ত ভাবে ও সন্তর্পণে স্মৃতি-সাধনা করে চলেন। প্রাতরাশের পর ভোজনশালা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে আবার সারিবদ্ধভাবে নিজ নিজ কৃত্যে ফিরে যাবার পালা।

উপক নিজ কুটিতে ফিরে না গিয়ে শাস্তার কুটিতে যান। দ্বার-প্রহরী ভিক্ষুর অনুমতি নিয়ে ধীর পায়ে শাস্তার কুটিতে প্রবেশ করেন। শাস্তা তাঁর প্রাতরাশ ঊষাকালেই সেরে নিয়েছেন। কিছু উপাসক-উপাসিকা এসেছেন দর্শনার্থী ও পুণ্যাভিলাষী হয়ে। কিছু ভিক্ষুও বসে আছেন শাস্তার নির্দেশের অপেক্ষায়। উপকও প্রতীক্ষারত থাকেন।

একে একে সবাই চলে গেলে উপক এবার উঠে এসে শাস্তার সম্মুখে নতজানু হয়ে প্রণাম করে বসে পড়েন। গতকাল রাতের বৃত্তান্ত সব খুলে বলেন। শাস্তা নির্দেশের সুরে বলেন- ওঁভাবে হঠাৎ তোমার শ্মশানে যাওয়াটা উচিত হয় নি। শ্মশানে ধ্যান করার কিছু অতিরিক্ত প্রস্তুতি নিতে হয়। প্রস্তুতি না নিয়ে গেলে উপদ্রবের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা প্রচুর থাকে। গতকাল রাতে যে বিকট শব্দ শুনেছিলে তা

মানুষের বা পশুর শব্দ ছিল না। তা ছিল অমানুষী শব্দ ।

উপক - অমানুষী-শব্দ কাকে বলে?

শাস্তা - ভূত, প্রেত, যক্ষাদির শব্দ। তাদের এলাকায় অপরিচিত কাউকে দেখতে পেলে তারা ওভাবে বিকট চিৎকার করে যাতে অপরিচিত ব্যক্তি ভয়ে সরে পড়ে। ধ্যানে বসার পূর্বে তুমি বুদ্ধগণের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেছিলে। তারা বুঝতে পারে তাদেরকে বিরক্ত করা তোমার উদ্দেশ্য নয়। অপরিমেয় মৈত্রী-ভাবাপন্ন হয়ে শ্মশানে ধ্যান করতে হয়। শাস্তাকে বন্দনা করে উপক এবার ধীর পদক্ষেপে নিজ কুটিতে প্রবেশ করেন।

এবার (আবার) উপক নিজ কুটিতে ধ্যানাভ্যাস শুরু করেন। স্মৃতি করে চলেছেন অনেকক্ষণ যাবৎ। কখনও তার শ্বাসের গতির অনুভূতি লম্বাকার হয়ে দুই ভ্রূর মধ্য বিন্দু অবধি হয়। কখনও গলার কণ্ঠনালী বেড়ে যায় মনে হয়। আবার কখন তা আবক্ষ অবধি হয় মনে হয়। আবার কখন স্মৃতি সরে গিয়ে নাভির ওঠা-নামায় চলে আসে। নাভি ফুললে 'ফুলছে' আর কমলে 'কমছে' জানা হয়। কখনও শরীরের অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও ফোলা ও কমাটা অনুভূত হয়। ঐ অনুভূতিতেই স্মৃতি অনেকক্ষণ থাকে।

এভাবে কিছুক্ষণ স্মৃতি-সাধনা করার পর উপকের মনে হতে থাকে যেখানেই শারীরিক অনুভূতি সেখানে স্মৃতি। যেখানে স্মৃতি সেখানে অনুভূতি। স্মৃতি ছাড়া যেন কোন প্রকারের অনুভূতি হয় না। কেশাগ্র হতে হাতের বা পায়ের নখাগ্র অবধি মন স্মৃতি-সহকারে সঞ্চরণ-শীল আছে। এমন কোন দৈহিক বা বাচনিক কাজ হয় না যেখানে স্মৃতি থাকে না। দেহে কোন ক্লান্তি নেই। সারা শরীরটা যেন একটা মাংস-পিণ্ড হয়ে বসে আছে। মন যেন মাছি বা প্রজাপতির ন্যায় কখন

এখানে কখনও ওখানে উড়ে বেড়াচ্ছে। আর কখনও যেন মন তার চিরকালের চঞ্চল স্বভাব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে কোন এক বিন্দুতে স্থির হয়ে পরাগের রসাস্বাদন করছে।

স্মৃতি-সাধনার এক স্তরে মনে হয় তার মন যেন এক উন্মুক্ত মন-জগতে বিচরণ করছে। তিনি যেন নিজেকে বিদেহী বলে অনুভব করেন। যে কৃষ্ণ-কালো দেহবর্ণ দেখে চাঁপা তাকে 'কালা' ডেকে বিদ্রূপ করতো তাও যেন দেহহীন হওয়ায় বিবর্ণ হয়ে শুভ্রাতিশুভ্র অনিন্দ্য হয়ে পড়েছে। এবার তার মন স্থূল বাহ্য জগতের সম্বন্ধ ছিন্ন করে। তবে কি তার ইন্দ্রিয়-শক্তি শিথিল বা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে? না, তাতো না। তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করছেন তার মানসিক এবং ইন্দ্রিয়-কর্মক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বেড়ে গেছে।

ক্রমশ তিনি অন্তর্জগতের বিতর্কময়, বিচারণীয়, প্রীতি-যুক্ত, সুখময়, উপেক্ষাময় এবং একাগ্রতাযুক্ত বিভিন্ন স্তর ভেদ করে এগিয়ে চলেন। সমাধি লাভ করেন। এ সমাধি সলিল- সমাধি নয়। এ সমাধি শ্মশান-সমাধিও নয়। সাধনা-জগতের প্রথম চরণ হল এ চিত্ত-সমাধি। এখানে নেই দুঃখ। নেই চিত্ত-চাঞ্চল্য। আছে শুধু চিত্তের প্রশান্তি।

স্মৃতি-সাধনার ক্রমপর্যায়ে অন্তর্জগতের এ অন্তর্যাত্রায় উপকের অন্তর-চিত্তও বাহ্যজগতে দৃশ্যমান নীল, নিঃসীম নিরাকার মহাকাশতুল্য বলে মনে হয়। আকাশোপম অন্তরাকাশে যথেচ্ছা বিচরণের এক পর্যায়ে তার ধারণা জন্মে অন্তরাকাশের তুলনায় নীল মহাকাশ অতি তুচ্ছ। অতি ক্ষুদ্র। রোমাঞ্চকর স্মৃতি-সাধনায় উপকের বিন্দুমাত্র আলস্য নেই। বিন্দুমাত্র বিরাম নেই। নিত্য নতুন অনুভূতি। নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা। এবারের অভিজ্ঞতায় তার আত্ম-প্রত্যয় জন্মে চিত্তের ভেতরের জগতও অনন্ত নয়।

অন্তত তাঁর অন্তর্জগতের অন্তস্থ দুর্গম চেতনা বিজ্ঞান-শক্তি বিজ্ঞানময় অনন্ত-জগতে যথেচ্ছ বিচরণকালে উপক এমন এক দিগন্ত বিন্দুতে পৌঁছোন যেখানে তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেন- 'সে কি আছে? না, নেই?' অবস্থার বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারেন- এ অবস্থাকে সম্পূর্ণ সংজ্ঞাযুক্ত বা সম্পূর্ণ সংজ্ঞা-মুক্ত কোনটিই বলা যায় না। এটি 'নৈব-সংজ্ঞা না-অসংজ্ঞা' মানসিক অবস্থা। বিষয় ও বিষয়ীর কোন ভেদ জ্ঞান নেই। দুধে জলে যেন একাকার। বিন্দুতে সিন্ধুবৎ। এও এক অদ্ভূত মানসিক অবস্থা। সমাধির চরম সীমান্ত বিন্দু। সমাধি-ভগ্নের পর প্রকৃতিস্থ হলে উপক চিন্তে করেন- চাঁপা আর সে যখন পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হত, তখনও তারা আত্মহারা হয়ে একাকার হত। সেই আর এই দুই একাকারের কত তফাৎ। একেবারে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

সেই একাকারজনিত সুখ পরাশ্রিত। পরাশ্রিত সুখ কখনই চিরস্থায়ী নয়। কার্য-কারণে সঞ্চালিত এই অনিত্য জীবন ও জগতে প্রতি পলে প্রতি পদে প্রিয়-বিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রিয়জন-যোগ-জনিত সুখ সব সময়ই কাম্য। প্রিয়জন-বিয়োগ-জনিত দুঃখ সব সময়ই অকাম্য। প্রিয়জনযোগে অধিক অধিককাল যুক্ত থাকার কামনা-বাসনা জন্মে। অথচ প্রিয়জনযোগের পরিস্থিতি মানুষের বশীভূত নয়। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাকে প্রিয়বিচ্ছেদের সম্মুখীন হতে হয়। কাম্য প্রিয়জনযোগ স্থিতি হীন এবং তদ্‌স্থলে অকাম্য প্রিয়জন-বিয়োগ অধিক স্থিতিশীল হওয়ায় অনুতাপ-পরিতাপ, শোক-পরিবেদন এবং দুঃখ-দৌর্মনস্য পরিমাণে পলে পলে দ্বিগুণ চতুর্গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যোগে সংখ্যার বৃদ্ধি (নিরন্তর হয়)। শেষে তা অনন্ত হয়। অনুরূপভাবে নিরন্তর বৃদ্ধিতে তৃষ্ণাও অফুরন্ত হয়। পরিণামে তজ্জনিত সমস্যা এবং ভয়ও হয় অফুরন্ত। ভয়-মিশ্রিত সুখ কখনই সুখ নয়। এ কারণে ভাবের সুখ-যোগের সুখ

সব সময়ই অফুরন্ত দুঃখজনক।

'নৈব-সংজ্ঞা না-অসংজ্ঞা' স্থিতিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্য-সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয়। এ দুয়ের লোপে বিয়োগের সুখ আসে। বিয়োগজনিত শূন্যত্বে আর কোন প্রকারের কামনা-বাসনার বৃদ্ধি বা হ্রাসের সম্ভাবনা থাকে না। একারণে বিয়োগ বা অভাবজনিত সুখ যোগ-জনিত সুখাপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্ম ও স্থিতিশীল। বিয়োগেই শূন্যত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা। আর তৃষ্ণা-ক্ষয়ে তৃষ্ণা-নিবৃত্তির সম্ভাবনা, তৃষ্ণার অভাবে সমস্যা ও ভয় উভয়ের অভাব। উভয়ের অভাবে (অফুরন্ত) আনন্দ-প্রীতি- সুখ হয় অফুরন্ত। নিরন্তর অফুরন্ত আনন্দই হয় স্থিতিশীল। এ সুখই প্রকৃত সুখ। এ সুখই বিজ্ঞজনকাম্য। নৈব-সংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা স্থিতির ভিত্তিতে উপক এসব নানা কথা চিন্তা করতে থাকে। মানুষ মিছে মায়ামরীচিকাময় সংসারে তন্ন তন্ন করে সুখান্বেষী হয়। কালক্ষেপন করে চলে জ্ঞানের অভাবে, সে জানে না যে তার অন্তর্জগতেই রয়েছে অনন্ত সুখ-ভাণ্ডার।

এবার মনে প্রশ্ন জাগে- সমাধির এই চরম সীমান্ত-বিন্দুর পরও কি তার কিছু করণীয় রয়েছে, না এই ইতি। তিনি কি সেই অফুরন্ত অভীষ্ট সুখের অধিকারী হতে পারবেন না? একদিন পূর্বাহ্নে ভিক্ষান্ন গ্রহণের পর অতি সন্তর্পনে সম্যক্- স্মৃতি সহকারে তিনি শাস্তা সুগতের নিকট উপস্থিত হন। প্রশ্ন করেন- শাস্তা, অন্তর্জগতের অন্ত কি এখানেই? এই কি প্রকৃত সুখের স্বরূপ?

বুদ্ধ মৃদু হেসে বলেন- আধ্যাত্মিক অন্তর্জগতের অন্ত এখানে নয়। লৌকিক বাহ্য-জগত হতে লোকোত্তর অন্তর্জগতের প্রবেশ-পথ ত্রি-চরণে বিভক্ত। প্রথম শীলময় জগত। দ্বিতীয় সমাধিময় জগত। তৃতীয় ও সর্বান্তিমে প্রজ্ঞাময় জগত। তোমার মানসিক স্থিতি এখন মধ্যম

চরণে। প্রজ্ঞাময় জগতে এখনও তোমার প্রবেশ ঘটে নি। প্রজ্ঞাময় অন্তর-জগতের অন্তঃস্থলে (চরমবিন্দুতে) পৌঁছানোটাই সাধকের লক্ষ্য। তোমার সাধনার এ সঙ্গীন মূহূর্ত্ত। একাধিক স্তর রয়েছে এখানেও। সাধকের পথভ্রষ্ট হবার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। অতএব উপক, উপাসনায় ক্ষান্ত হয়ো না। স্মৃতি-সাধনায় সতত প্রয়াসশীল হও। উপক বুদ্ধের কাছে প্রজ্ঞাময় অন্তর-জগতের প্রবেশ-পন্থা জানতে চায়। বুদ্ধ কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন, ধর্মানুদর্শন এই চার স্মৃতি-প্রস্থানের সারমর্ম বুঝিয়ে দিগ্দর্শন করান।

পাঁচ প্রকারের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য জগতের সম্বন্ধ ক্রমশ সংকীর্ণতর হতে থাকে। যে সুষ্ঠ বলিষ্ঠ দেহ-সৌষ্ঠবে চাঁপা আকৃষ্ট হয়েছিল, তা এবার তার কাছে পুঁতি দেহ-বন্ধন বা দেহভার বলে মনে হয়। ভার-বাহক যেমন যথাস্থানে ভার রেখে দায়িত্ব (ভার) মুক্ত হতে চায়, খাঁচায় বাঁধাপাখী যেমন বাঁধা-বাঁধন হারা হয়ে উন্মুক্ত হতে চায় উপকের অশরীরী মনও এবার এ দেহ-বন্ধন ছিঁড়ে ও দেহ-ভার ছেড়ে ছুঁড়ে দূরে অনেক দূরে উন্মুক্ত নীলাকাশে ছুটে বেরিয়ে পড়তে চায়। তার মনে হতে থাকে তিনি যেন ঐ নীল নিঃসীম আকাশের কোথাও লুকানো কোনো এক সুখ-সম্পদের নিশ্চিত সন্ধান পেয়েছেন।

এভাবে তিনি যতই অন্তর আকাশের যাত্রায় লীন হতে থাকেন ততই যেন তার মনের পরিধিও বিশাল হতে বিশালতর হয়ে যাচ্ছে। এমন এক স্থিতি এসে পৌঁছোয় যখন তার মনে হয়- তিনি যেন এক অতি শক্তিশালী দিব্য দুরবীক্ষণ যন্ত্রে এক অসহায় মহাকায় প্রাণীকে এক ক্ষুদ্রাকার কারাগারে আঁটসাঁট বাঁধা অবস্থায় অসহনীয় যন্ত্রণায় কাতরাতে দেখছেন। আর এক পরিস্থিতিতে তার মনে হতে থাকে তিনি যেন দিব্য বেতার-যন্ত্রে ঐ অসহায় প্রাণীর 'ত্রাহি, ত্রাহি' তার-স্বর স্পষ্ট শুনছেন।

উপক বুদ্ধ-নির্দেশিত পথে মনোনিবেশ করেন। তার বহির্মুখী চঞ্চল-চিত্ত ক্রমশ অন্তর্মুখী হয়। সমাধির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সোপানমালা একে একে উপক বেয়ে চলেন। অন্তর্জগতের গহন হতে গহনতর অভ্যন্তর প্রদেশে ক্রমশ তার প্রবেশাধিকার জন্মে। বিচিত্র অভিজ্ঞতা এ পথ চলার। কখন নিরানন্দ। কখনও আবার ঘনানন্দ। কখন মন্দ ছন্দ। কখনও অতি প্রীতি। কখনও আবার অতি ভীতি। কখন রাগ। কখন বিরাগ। কখনও নানা অজানা উত্তেজনা। কখনও ব্যাথা ভরা বেদনা। কখনও হাসি, কখনও কান্না। সব মিলে অন্তরজগতের এ নিরন্তর অন্তরযাত্রা তার নিকট বড়ই রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর হয়ে দাঁড়ায়।

আজন্ম বদ্ধমূলধারণা ছিল এ বিশাল ভূ-ভারত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই বুঝি এক মাত্র অসীম তত্ত্ব। ধর্ম-চর্চায় জ্ঞান বাড়ে। তিনি জানতে পারেন চরাচর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের চারপাশে বিদ্যমান চার মহা-সমুদ্রই পারাপারহীন। আরও গহন অধ্যয়নে জানেন চার মহাসমুদ্রের চার পাশে যে বায়ুমণ্ডল রয়েছে তাও নিঃসীম। পরে তিনি আরও জানেন এই বায়ুমণ্ডলেরও এক সীমা আছে। এই সীমা পেরিয়ে গেলেই নাকি নীলাকাশের দেশ। সে দেশের নিজস্ব রঙ্গ-রূপ নেই। তাই তা দেখতে নীল। ঐ নীলাকাশ নাকি নিঃসীম নিরাকার।

এভাবে প্রতি রাতে স্মৃতি-সাধনা-জনিত যে সব অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা হতো তা উপক পরদিন প্রাতরাশের পর এসে শাস্তাকে বলতেন। আর সারাদিনের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার কথা প্রতিদিন সান্ধ্য বন্দনার পর শাস্তাকে জানালে শাস্তা প্রয়োজন অনুসারে উৎসাহবর্দ্ধক উপদেশ দিয়ে সমস্যা নিরাকরণের উপায় বলে দিতেন। উপক তা শ্রদ্ধাভরে শুনতেন আর পালন করতেন। এর পরিণামে উপক একদিন অনাগামীফলে প্রতিষ্ঠিত হন।

এর কিছুদিন পর উপক মারা যান। মারা গিয়ে অবিহা-ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করেন। [সংযুক্তনিকায়ে বর্ণিত হয় যে উপক ভগবান বুদ্ধকে দর্শন করার পর অন্য ছয়জন শিষ্যের সঙ্গে জন্মলাভ করেন। ব্রহ্মলোকে জন্ম নেবার পর ধ্যানাভ্যাসের পরিণাম-স্বরূপ ঐ লোকেই অরহত্বফলে প্রতিষ্ঠিত ও পরিনিবৃত হন। মধ্যমনিকায়ের টীকাগ্রন্থ পপঞ্চসূদনী অনুসারে উপক অবিহা স্বর্গে জন্ম গ্রহণের সাথে সাথেই অর্হৎ হন।]

অন্য দিকে চাঁপা ও তার ছেলের দিন যেন তেন প্রকারেন কাটছিল। মাঝে মাঝে চাঁপার মনে উপকের দীর্ঘ অনুপস্থিতি এক চাপা বিরহ-বেদনার সৃষ্টি করেছিল। দৈহিক বর্ণদোষ ছাড়া উপকের আর তো কোন দোষ ছিল না। তাকে তো উপক কোন অংশে কম ভালবাসত না। কেন সে মিছে-মিছি মানী হল। গোঁ না ধরলেই হত। চাঁপা বাইরে প্রকট না করলেও ভালভাবেই বুঝতে পেরেছে তার নিজের কারণে সে স্বামী-বর্জিত হয়েছে। সাথে ছেলে সুভদ্রও বিনাদোষে বাপ-হারা হয়েছে।

সুভদ্র - প্রায়ই জিজ্ঞেস করে- বল না, মা, বাবা কোথায় গেছে?

চাঁপা - তোর বাবা তার এক বন্ধুকে দেখতে গেছে।

সুভদ্র - নাম কি বাবার ঐ বন্ধুর?

চাঁপা - আনমনা হয়ে উত্তর দেয়- অনন্তজিন।

সুভদ্র - এটা আবার কেমন নাম? তা যাক্ গে, থাকেন কোথায় তিনি?

চাঁপা - তোর বাবার মুখে শুনেছিলাম উরুবেলায় তার সাথে দেখা হয়েছিল। ঐ অনন্তজিন নাকি বারাণসী গেছেন। তাঁর ব্যাপারে এর বেশী কিছু আমার জানা নেই।

সুভদ্র - সে কবে দেখেছি বাবাকে। অনেকদিন হল না, মা? বাবা কি আর আসবে না আমায় আদর দিতে? রাগ করেছেন বুঝি?

চাঁপা - কেন রে? তোকে কি আদর করি না বুঝি আমি?

সুভদ্র - আমি কি বলেছি, তুমি আদর কর না। বাবা আসছে না। বাবা নেই, তাই বলছি। কেমন লাগছে আমার।

চাঁপা - হয়ত তার বন্ধুর দেখা হয় নি। হয়ত তার বন্ধু তোর বাবাকে আরো কিছুদিন থাকার আগ্রহ করেছে।

সুভদ্র - বাবা ফিরে আসবে তো, মা?

চাঁপা - কেন রে? 'আসবে না, আসবে না' বারবার বলছিস্ কেন? তোকে দেখতে নিশ্চয়ই আসবে।

সুভদ্র - তোমাকে দেখতে আসবে না বুঝি।

চাঁপা - তোকে দেখতে আসলেই আমাকে দেখবে। দু'জনকে দেখার জন্যে কি দুবার আসবে?

সুভদ্র - আমি একটু বড় হলে নিশ্চয়ই বাবাকে খুঁজে আনতাম। কোথায় গেছেন তার ঠিক ঠিকানাও তো জানা নেই আমার। তোমারও জানা নেই।

চাঁপা - তোকে যেতে হবে না খুঁজতে। শেষে তোকে খুঁজতে যেতে হবে আমাকে। বাবার বড়ই আদরের ছেলে। তোর বাবাও নেই। তুইও থাকবি না। আমি কোন চাঁদমুখ দেখে থাকবো? বল তো? তোকে তোর দাদুর কাছে নিয়ে যাই। দাদু তোকে খুব আদর করবে। আনন্দে তোদের দিন কাটবে। আমি কালই বের হব তোর বাবার খোঁজে। দেখা হতেই নিয়ে আসব তোর বাবাকে। তা হলেই হবে

তো।

সুভদ্র - হ্যাঁ, মা। আমার ভাল মা।

চাঁপা ছেলেকে কোলে করে চলে যায় বাপের গ্রামে।

চাঁপার বাবা- জামাই কই? দেখছি না যে।

বার বার জানতে চাইলে চাঁপা সংকোচের সাথে সব খুলে বলে বাবাকে। শেষে সে এও জানায়- আর সে স্বামী হারা হয়ে থাকতে পারছে না। ভদ্রকে তার কাছে রেখে সে এবার স্বামীর সন্ধানে বেরোবে।

এটা বকাবকি করার সময় নয় ভেবে চাঁপার বাবা বলেন- যাও, ভদ্রের কথা মনে রেখো।

চাঁপা বাবাকে প্রণাম করে। ভদ্রকে খুব আদর করে। দুজনের কাছ হতে বিদায় নিয়ে চাঁপা বেরিয়ে পড়ে স্বামীর খোঁজে। উরুবেলার নৈরঞ্জনা নদীর পাশের গ্রামগুলোতে চাঁপা তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেরায়। গ্রামের বুড়োবুড়ীদের কাছে যায়। জিজ্ঞেস করে সে- এখানে অনন্ত জিন বলে কাউকে তারা জানেন কিনা? বছর কয়েক পূর্বেও কি এ নামে কেহ এখানে থাকতো?

গ্রামবাসী - এ নামের কাউকে বিশেষত কোন সাধু-সন্ন্যাসীকে তারা জানেন না। তবে কঙ্কাল-সার মৃতবৎ এক সন্ন্যাসীর দুষ্কর সাধনার কথা তারা তাদের পরিবারের বড়োদের মুখে শুনেছেন। লোকমুখে শোনা যায় তিনি জিন হয়েছিলেন। তবে তিনিই অনন্তজিন কিনা তা তাদের জানা নেই। আমরা যে জিনের কথা বলছি তিনি সমগ্র মগধে, শুধু মগধেই নয় কাশী, কোশল, কোলীয় ইত্যাদি পাশের প্রায় সব রাজ্যে তথাগত বুদ্ধ নামে অতি সুপরিচিত।

চাঁপা - বেশ, ঐ জিনেরই পরিচয় দিন। আপনাদের ঐ জিন আমার স্বামীর বন্ধু অনন্তজিনের হয়ত কোন খোঁজ দিতে পারবেন।

গ্রামবাসী - এই অশ্বত্থবৃক্ষের নীচে বসে ঐ জিন সিদ্ধি লাভ করেন। এর পূর্বে এই নদীর অপর পারে কয়েকটি জায়গায় দুষ্কর কঠোর তপশ্চর্যা করেছিলেন। এমন তপস্যা আজ অবধি কেহ করেন নি। ভবিষ্যতেও কেহ করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। তা দেখে পাঁচজন তপস্বী তাঁর শিষ্য হন।

ঐ পারেরই আর এক অশ্বত্থ-বৃক্ষের তলে বসে তিনি সুজাতার দেওয়া পায়েসান্ন গ্রহণ করেছিলেন। তা দেখে তাঁরা তাঁকে পথভ্রষ্ট হয়েছেন মনে করেন। মত পার্থক্য হওয়ায় তাঁরা বারাণসীর ঋষিপত্তনে চলে গিয়েছিলেন। সে যাক্ গে তাঁদের গুরুশিষ্যের কথা। সে অনেক কথা।

ঐ জিন উরুবেলা হতে বারাণসী যান। ধর্মচক্রপ্রবর্তনের মাধ্যমে এক নতুন ধর্মের প্রচার করেন। তা শুনে ঐ পাঁচজন প্রকাণ্ড পণ্ডিত পুনরায় তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন। পরে আরো অনেকে তাঁর শিষ্য হন।

শুনেছি এক নতুন 'সংঘ' তৈরী করেছেন। ঐ সংঘে নাকি সমাজের উঁচু-নীচু সব বর্গ ও শিক্ষিত-অশিক্ষিতদের অনেকে প্রবেশ করেছেন। তিনি নির্জনে কেবল ধ্যান-তপস্যা করেন না। গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে সাধারণ মানুষের ভাষায় ধর্ম-কথা শোনান। শিষ্যদেরও তা করতে বলেন। মগধবাসীদের অনেকে, এমন কি মগধরাজ বিম্বিসারও সপরিবার তাঁর শিষ্য হয়েছেন।

বারাণসী হতে রাজগৃহে যাবার পথে বুদ্ধ এই উরুবেলায় আবার এসেছিলেন। কিছুদিন ছিলেনও। এখানে উরুবেলা-কাশ্যপের এক বড় আশ্রম ছিল। ঐ আশ্রমের এক পুরোনো যজ্ঞশালায় এক ভয়ানক বিশাল বিষধর সাপ থাকতো। লোকে তাকে ভয়ে নাগরাজ বলতো।

আশ্রমবাসীদের কথা দূরে থাকুক সমগ্র মগধে মহাতেজস্বী ও মহাতপস্বীরূপে খ্যাতি-প্রাপ্ত ঐ উরুবেলা-কাশ্যপও ঐ নাগরাজকে সমীহ করে চলতেন। বারাণসী থেকে ফিরে আসার পথে বুদ্ধ তাঁর ঐ আশ্রমে থাকার অনুমতি চান। উরুবেলা-কাশ্যপ বুদ্ধকে অপদস্থ করার উদ্দেশ্যে ঐ পরিত্যক্ত যজ্ঞশালায় থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন। ঐ কুটিতে প্রবেশ করে বুদ্ধ প্রতিদিনের ন্যায় ধ্যানস্থ হন।

বুদ্ধের প্রবল তপতেজ দেখে নাগরাজও তার তেজ দেখাতে আরম্ভ করে। এভাবে উভয়ের মধ্যে অধিকাধিক তেজ-শক্তি দেখাবার এক প্রদর্শন প্রতিযোগিতা চলে।

সে কি তুমুল কাণ্ড। দুই নাগরাজের দেহ যেন অগ্নিপিণ্ড হয়ে পড়েছিল সেদিন। ঐ যজ্ঞশালা যেন আগুনের লালিমায় লালে লাল হয়ে পড়েছিল। সারা আশ্রমে, শেষে সারা গ্রামবাসীর মধ্যে হৈ হৈ রৈ রৈ হয়ে পড়ে ব্যাপারটা। অনেকে বলতে থাকেন বিষধর নাগরাজের কাছে জিনরাজ বুদ্ধ পরাস্ত হয়েছেন। অনেকের মুখে শোনা যায় বুদ্ধ মারা গেছেন। আবার অনেকের মুখে শোনা যায় উরুবেলা-কাশ্যপই চক্রান্ত করে বুদ্ধকে মারিয়েছেন। ঘটনা কি তা জানার জন্যে আশ্রমবাসী ও গ্রামবাসী সবাই যজ্ঞশালার চার পাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

চাঁপা গ্রামবাসীর কাছে জানতে চায়-- আসলে হয়েছিল কি?

গ্রামবাসী - বলছি। ভোর হতে না হতেই সবার ধারণা বদলে যায়। বুদ্ধ এক মাটির পাত্র হাতে যজ্ঞশালা হতে সহাস্য বদনে মন্থর গতিতে বের হন।

চাঁপা - ঐ ভিক্ষাপাত্রে কি ছিল?

গ্রামবাসী - ঐ বিশালকায় বিষধর নাগরাজ।

চাঁপা - তাই না কি? ফণা দেখায় নি?

গ্রামবাসী - ফণা দেখাবে কি? একে বারে শান্ত-দান্ত ও নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল যেন সে একটি কেচোঁ।

চাঁপা - তারপর সাপটাকে কি মেরে ফেলা হয়েছিল?

গ্রামবাসী - অনেকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু বুদ্ধ মারতে দেন নি। তাঁর নির্দেশে ঐ নাগরাজকে গ্রামের বাইরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

চাঁপা - তা হলে তো তিনি নিশ্চয়ই একজন মহাপুরুষ হবেন। সুযোগ পেলে অবশ্যই তাঁর সাথে দেখা করবো। আচ্ছা, ঐ উরুবেলা কাশ্যপ কি এখন এখানে থাকেন না? হয়ত তিনি ঐ অনন্তজিনের কোন খোঁজ দিতে পারেন?

গ্রামবাসী - তিনি এখানে আর থাকেন না।

চাঁপা - কেন?

গ্রামবাসী - হ্যাঁ, বলছি তাঁর কথাও।

উরুবেলা-কাশ্যপের মনে নিজের তপতেজের ব্যাপারে যে মিথ্যে বদ্ধ-ধারণা ছিল তা ভাঙ্গে। তিনি সদলবলে বুদ্ধের শিষ্যত্ব বরণ করেন।

শোনা যায় শিষ্য হবার পূর্বে তারা তাঁদের আশ্রমের জটা-বল্কলাদি সব এই নৈরঞ্জনা নদীর জলে তিলাঞ্জলী দেয়। তা শুনে উরুবেলা-কাশ্যপের অন্য দুই ভায়েরাও নিজেদের শিষ্যদের নিয়ে বুদ্ধের শরণাপন্ন হন। এই উরুবেলাতেই কয়েকদিনের মধ্যেই হাজার জটিল শিষ্যের শিষ্যত্ব গ্রহণের এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল। আরো

অনেক আশ্চর্যজনক ঋদ্ধি-শক্তি প্রদর্শনের ঘটনা বুদ্ধ এখানে জনকল্যাণার্থে দেখিয়েছিলেন। এসব কারণে লোকে তাঁকে মহাতান্ত্রিকরূপেও জানেন। এতসব ঘটনা তোমার কোন কাজে আসবে কিনা সন্দেহ। মোট কথা তিনি যেমন তেমন সাধু-সন্ত নন। ঐ বুদ্ধ ছিলেন এক অসাধারণ মহাপুরুষ।

হাজারেরও বেশি নতুন শরণাগত শিষ্য-সমূহের সাথে শাস্তা রাজগৃহে গিয়েছিলেন। সেখানেও তিনি অনেক অনেক অদ্ভূত ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। সব কথা কি আর বলা যায়?

কোথাও তিনি অধিককাল কাটান না। গাড়ী-ঘোড়া বা কোন প্রকারের বাহনের প্রয়োগ করেন না। পায়ে হেঁটে বিচরণ করেন। তিনি একাহারী মিতাহারী। তিনি ত্রি-কালজ্ঞ। সর্বজ্ঞও তিনি। কাজেই অনন্ত জিনের খোঁজে অযথা সময় ব্যয় না করে সোজা তুই বুদ্ধের কাছে চলে যা। তিনি তোর স্বামীর সন্ধান নিশ্চয়ই বলে দেবেন।

চাঁপা - ধন্যবাদ। এক কথা জানতে চেয়েছিলাম। আপনি তো অনেক কথা শুনিয়ে দিলেন। এক নতুন মহাপুরুষের সম্পর্কে পরিচয় দিলেন। আমার মোটেই জানা ছিল না। নমস্কার।

বিলম্ব হলে হয়ত বুদ্ধ অন্য কোথাও চলে যাবেন, তাই রাজগৃহে যাবার সোজা পথে পা বাড়ান। চাঁপা এই প্রথম ঘরের সীমা পেড়িয়ে বাইরে বেরিয়েছে। দুর-যাত্রার পথ চলার অভ্যাস তার নেই। কিছুদুর হেঁটে গাছতলায় বাঁশতলায় বিশ্রাম নেয়। এভাবে কয়েকদিনে রাজগৃহে সে পৌঁছোয়। রাজগৃহ শহরটা উঁচু-নীচু বেশ কয়েকটি পাহাড়ে ঘেরা। বনাঞ্চলও রয়েছে। দেখতে বেশ সুন্দর। পথে পথচারীর ভীড়। নানা মতালম্বী সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রম রয়েছে। কাকে কিভাবে সম্বোধন করবে, এ নিয়েও চাঁপা দ্বিধাগ্রস্ত। তবুও সংকোচের সাথে একজন

বয়স্ক পথচারীকে জিজ্ঞেস করে বসে সে।

চাঁপা - নমস্কার। কিছু মনে করবেন না তো? কিছু জানতে চাই আপনার কাছে।

নগরবাসী - না, না। এতে মনে করার কি আছে? জিজ্ঞেস কর যা জানতে চাও।

চাঁপা বুদ্ধের কথা জানতে চাচ্ছিল, কিন্তু ভুলে অনন্তজিন কোথায় অবস্থান করেন-- জানতে চাইল ঐ নগরবাসীর কাছে।

নগরবাসী- দেখ, আমরা কোন অনন্তজিনকে চিনি না। রাজগৃহ মগধের রাজধানী হবার সাথে একটি তীর্থস্থানও। এখানে প্রায়ই সাধু-সমাগম হয়। নানা দেশের নানা প্রান্তের নানা পরম্পরার লোকের মেলা হয়। দেখতেই পাচ্ছ। কে কার খোঁজ রাখে? একটি কথা জিজ্ঞেস করছি- ঐ অনন্ত- জিনের খোঁজ কেন করছ, বাছা? বল তো।

চাঁপা - দেখুন, আমি এক বিবাহিতা মহিলা। আমার নাম চাঁপা। আমার স্বামীর নাম উপক। আমার এক ছেলে আছে। নাম সুভদ্র। ঐ অনন্ত- জিন আমার স্বামীর বন্ধু। স্বামী বন্ধুর সাথে দেখা করতে বেরিয়েছিলেন। অনেকদিন হয় ফিরে আসেন নি তিনি। স্বামীর সাথে উরুবেলায় দেখা হয়েছিল ঐ অনন্তজিনের। স্বামীর মুখে এ টুকুই শুনেছি মাত্র। তাই তার খোঁজেই অনন্তজিনের খোঁজ করছি।

নগরবাসী - বুঝেছি। স্মরণে পড়ছে এক মহাপুরুষ উরুবেলা থেকে সিদ্ধি-প্রাপ্ত হয়ে এখানে এসেছিলেন। মগধরাজ বিম্বিসার ও তাঁর পরিবার তাঁর পরম ভক্ত। শুধু তাই নয়। রাজগৃহ, মগধের অগণিত গণমান্য ও সাধারণ মানুষও তাঁর উপদেশ শুনে উপকৃত হয়েছেন। তিনি ভগবান বুদ্ধ- এই এক নামেই সুপরিচিত। তিনি সর্বজ্ঞ। দিব্য-

দ্রষ্টাও। দর্শন-মাত্রই তিনি দর্শনার্থীর মনের কথা জেনে ফেলেন। সমস্যার সমাধানও নিমেষে করে দেন। আমার মনে হয় এদিক ওদিক না গিয়ে সোজা তাঁর শরণাপন্ন হওয়াই ভাল হবে।

চাঁপা - অনেককথা বললেন, কিন্তু আসল কথা তো বল্‌লেনই না। থাকেন কোথায় তিনি? দেখতে তিনি কেমন?

নগরবাসী - নাক-নক্সায় তিনি অতি সুপুরুষ। কাঞ্চন-বর্ণের। পীতবস্ত্রধারী। মুণ্ডিত তাঁর মাথা। মাথার অগ্রভাগ একটু উঁচু। হাজারের মধ্যেও তাঁকে সহজে চেনা যায়। ভিক্ষাপাত্র হাতে ভিক্ষান্ন-সংগ্রহে তিনি অলিতে গলিতে যান। বহুগুণমণ্ডিত হয়েও তিনি মাটির মানুষের সরল ভাষায় কথা বলেন। সহজ শৈলীতে গুঢ় ও গম্ভীর কথা বোঝান। তাঁর উপদেশ- শৈলীতে ও তাঁর বাণীতে এমন এক মোহক শক্তি আছে যার কারণে মানুষ মন্ত্র-মুগ্ধ হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকে। তাঁর উপদেশ শুনে শ্রোতারা তাদের প্রিয়জন ও প্রিয়তমার কথাও ভুলে যায়।

চাঁপা - পরিচয় তো দিলেন। কিন্তু তাঁর অবস্থান কোথায়? কোথায় গেলে তাঁর দেখা পাব? এখনও তা বললেন না।

নগরবাসী - তিনি অনাবশ্যক একস্থানে বেশীদিন কাটান না। যেখানে থাকলে বহুজনের উপকার হয়, বহুজনের হিত হয় তিনি সেখানে অধিককাল কাটান। সাথে শিষ্য-সমূহকেও নিয়ে যান। হ্যাঁ, এতটুকু মনে আছে উরুবেলা থেকে রাজগৃহে এসে প্রথম বার বেণুবনে ছিলেন। আমাদের রাজা তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত। তাঁর ও তাঁর শিষ্যসংঘের হিতার্থে রাজা তাঁর বিশাল উদ্যান দান করেন। তাঁদের থাকার সুবিধার্থে বিহারও তৈরী করিয়ে দান করেন। ঐ উদ্যানে অনেক বাঁশঝাড় রয়েছে। লোকে একে বেণুবন বলে। বেশী দুরে নয়। কিছু

দুর গেলেই তপোদা-আরাম। ঐ যে পাহাড় দেখা যাচ্ছে তার গোড়াতেই তপোদা-আরাম। তীর্থ-যাত্রীরা এখানে দুর দুর দেশ হতে স্নানের উদ্দেশ্যে আসে। গরম জলের ধারা রয়েছে। রাজগৃহে এসেছ যখন স্নান করে নিও। এমনও হতে পারে তোমার স্বামীরও সেখানে দেখা হয়ে যেতে পারে। অসম্ভব কিছুই নয়। ঐ তপোদারামের পাশেই বেণুবন। বেণুবনে গেলেই দেখতে পাবে এক আলাদা পরিবেশ। দেখতে পাবে গৈরিকবস্ত্রধারী অনেক সন্যাসী। তাঁদের সবার মাথা নেড়া। সবাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন। আচারে ব্যবহারে অন্য সব সাধু-সমাজ হতে অনেকটা ভিন্ন। অতি শিষ্টজন তাঁরা। মিষ্টভাষী। ব্যবহার-কুশলী। দয়ালুও বটে। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।

নির্দেশ মতো চাঁপা তপোদারামে যায়। সবাইকে গরম জলের ধারায় স্নান করতে দেখে লজ্জা সংকোচ ত্যাগ করে সেও স্নান করে। জল গরম হলেও স্নান করতে ভাল লাগল। ক্লান্তি-শ্রান্তি দুর হল মনে হল। স্নান সেরে এক কোনায় দাঁড়িয়ে রোদে গা ও গায়ের ভেজা কাপড় শুকিয়ে ফেলে। সাথে এদিক ওদিক চোখ বুলিয়ে নেয় স্বামীর দর্শন-লাভের আশায়। সে আশা দুরাশা হয়ে থাকে।

তপোদায় স্নান করাকালে ও গা শুকোনোর কালে অধিকাংশ স্নানার্থীর মুখে বুদ্ধের মহিমামণ্ডিত কথা শুনতে পেয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয় তার মন। আস্থা জন্মে তাঁর প্রতি। নিশ্চয়ই তিনি মহাপুরুষ হবেন। তা না হলে সবার মুখে একই কথা কেন? গা শুকিয়ে সে এবার বেণুবনের দিকে এগোয়। বেণুবন একেবারেই গা লাগানো। তপোদারামের পরিবেশ আর বেণুবণারামের পরিবেশে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এখানে পরিবেশ একেবারে শান্ত। শান্ত পরিবেশে মন এমনিতেই শান্ত হয়ে যায়। কিছু পীতবস্ত্রধারীকে গাছতলায় বাঁশতলায় বসে থাকতে

দেখা গেল। এদের কেহ অতি সন্তর্পণে পায়চারী করছে। আবার কেহ বিহার-প্রাঙ্গণ ঝাড়ু করছে। আর কেহ আশ্রমিক অন্য কাজে ব্যস্ত। চাঁপা অতি সন্তর্পণে তাদের একজনের কাছে যায়।

চাঁপা - আমি অনেক দুরদেশ থেকে এসেছি এক খোঁজে। আপনাদের কি বলে সম্বোধন করব, আমি জানি না। বলবেন কি দয়া করে?

বুদ্ধশিষ্য - উপাসিকে, 'ভন্তে' বলে আপনি আমাদের সম্বোধন করতে পারেন। আমরা ভগবান বুদ্ধের শিষ্য। নিঃসঙ্কোচে বলুন আমরা কিভাবে আপনার সাহায্য করতে পারি?

চাঁপা - আসলে আমি স্বামীর খোঁজে বেরিয়েছি। আমার ও স্বামীর মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছিল। তিনি রাগ করে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছেন। সে অনেকদিন। ফিরে আসেন নি আর। বাড়ীতে ছোট এক ছেলে আছে। বাবাকে না পেয়ে সে প্রায় আনমনা থাকে।

বুদ্ধশিষ্য - যাবার সময় তিনি কি কোন প্রকারের সংকেত দিয়ে যান নি তিনি কোথায় যাচ্ছেন?

চাঁপা - হ্যাঁ, কয়েকবার বলেছিলেন- তার এক বন্ধু রয়েছে। নাম তাঁর অনন্তজিন। আরও বলেছিলেন- তাঁর কাছে চলে যাবে। উরুবেলায় নাকি তাঁর সাথে দেখা হয়েছিল। স্বামীর খোঁজে আজ আমি সেই অনন্তজিনের খোঁজ করছি। অনন্তজিনের খোঁজে বেরিয়ে এখন তথাগত বুদ্ধের খোঁজ করছি, তবে দেখা পাই নি। লোকমুখে জানতে পারলাম তিনি নাকি সর্বজ্ঞ। দিব্যদ্রষ্টাও। সবার সব সমস্যার সমাধানে সমর্থ। আমার একটাই সমস্যা। স্বামীর সন্ধান। কোথায় গেলে তার দেখা পাই- এটাই কেবল জানতে চাই। শুনেছি ভগবান বুদ্ধ এই বেণুবন-বিহারেই থাকেন। তাঁর সাথে দেখা করিয়ে দিলে, ভন্তে, চিরকৃতজ্ঞ থাকবো আপনার কাছে।

বুদ্ধশিষ্য - উপাসিকে, আমরা এতকাল কাটিয়েছি এখানে। অনন্তজিন নামে কোন মুনি-ঋষিকে দেখি নি। এমন নামও শুনি নি। তবে আমাদের শাস্তা প্রভু বুদ্ধও একজন জিন। তিনি মারবিজয়ী। তুমি যে উরুবেলার কথা বলছ সেই উরুবেলাতেই আমাদের প্রভু বুদ্ধ সসৈন্য মারকে পরাস্ত করেছিলেন। অনন্তগুণের অধিকারী তিনি। সর্বজ্ঞ তো বটেই। তিনি অনেকের বিকট সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। তোমার সমস্যাটা তো তাঁর কাছে অতি তুচ্ছ। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রভু বুদ্ধ বর্তমানে বেণুবনে নেই। রাজগৃহে নেই। এমন কি মগধেও নেই। শ্রাবস্তীর এক উপাসকের আহ্বানে শ্রাবস্তী গেছেন। শুনেছি শ্রাবস্তী-বাসীর আহ্বানে তাঁকে আরও কিছুদিন শ্রাবস্তীতে থাকতে হতে পারে। কাজেই, ভগিনী, আপনি এদিক ওদিক না গিয়ে সোজা শ্রাবস্তী যান।

চাঁপা - একটি প্রশ্ন। শ্রাবস্তী কোথায়?

বুদ্ধশিষ্য - শ্রাবস্তী কোশলের রাজধানী।

চাঁপা - প্রণাম, ভন্তে।

বুদ্ধশিষ্য- যাত্রা শুভ হউক।

চাঁপা অগত্যা আর কি করে। আশা ছাড়ে নি। সাহসও ভাঙ্গে নি। নিজেকে সান্ত্বনা দেয়- লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ো না। তোমার লক্ষ্য-বিন্দু প্রায় হাতের নাগালে এসে পৌঁছেছে। আবার নতুন উৎসাহ মনে বেঁধে শ্রাবস্তী যাবার প্রস্তুতি নেয়। যাবার পূর্বে শ্রাবস্তীর পথ-ঘাট সব জেনে নেয় যেন মাঝে দিগ্‌ভ্রান্ত হতে না হয়। এবার থেকে সে মনস্থির করে নেয় যে সে আর কারও কাছে তার স্বামীর ও অনন্ত-জিনের খোঁজ নেবে না। শুধু শ্রাবস্তী ও প্রভু বুদ্ধেরই খোঁজ নেবে। কিছুদূর চলার পর চাঁপা ক্লান্ত হয়ে যেত। সাময়িক বিশ্রামের পর আবার চলার প্রস্তুতি নেয়। চলার পূর্বে পাশের বা পথচারীদের জিজ্ঞেস করে নিত সে- এ

পথদিয়ে কয়েকদিন পূর্বে কি প্রভু বুদ্ধ গেছেন? এ পথই কি শ্রাবস্তীর পথ?

পথচারী - হ্যাঁ, ভগিনী। প্রভু বুদ্ধ তাঁর বিশাল শিষ্যসঙ্ঘ সহ এ পথ দিয়ে গেছেন। আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। তিনি দেব-তুল্য পুরুষ। এই যে এই বৃক্ষের তলে বসে তিনি বিশ্রাম নিয়েছিলেন। বাণী তাঁর সমধুর। তাঁর সাথে কথা বলতে কারও কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। সরাসরি কথা বলা যায়। মনে হয় যেন তিনি মনের কথা সব জানেন। আমার নিজের কিছু জানার ছিল। দর্শন করা মাত্রই সমস্যার সমাধান করে ফেললেন। কিছুই জিজ্ঞেস করতে হয় নি। অবাক হওয়ার কথা নয় কি?

চাঁপা - অবাক্ হবারই কথা। আচ্ছা বলুন তো তিনি শ্রাবস্তীই গেছেন, না অন্য কোথাও?

পথচারী - কোথায় গেছেন তা তো আমাদের বলে যান নি। গৃহত্যাগী সন্যাসীদের কি কোন ঠাঁই ঠিকানা আছে? প্রবাদ আছে- যেখানে রাত, সেখানেই কাৎ। বোঝা বলতে কিছু নেই। চীবর আর ভিক্ষা-পাত্রই তো তাদের চলার পথের সম্বল। সরাসরি তাঁদের কারও সাথে এ ব্যাপারে আলাপ হয় নি। তবে তাঁদের নিজেদের মধ্যে শ্রাবস্তী যাবার কথা হচ্ছিল- এটা আমি শুনেছি।

চাঁপার উৎসাহ যেন আরও দ্বিগুণিত হয়। মগধ, কাশী, কোলীয় পেরিয়ে কোশলের সীমায় সে প্রবেশ করেছে। চলার পথে শ্রাবস্তীর অবস্থান ভাল মতে জেনে নেয় সে সবার কাছ হতে। শুধু চিন্তা প্রভু বুদ্ধ যেন শ্রাবস্তী ছেড়ে অন্য কোথাও না যান। তা হলে সব শ্রম ভেস্তে যাবে যে। এখানে ওখানে জিড়িয়ে নিয়ে কোন প্রকারে শ্রাবস্তী নগরীর মুখ্য দ্বারে চাঁপা পৌঁছোয়। স্থানীয় পথচারীর কাছ হতে জেনে নেয়

প্রভু বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে আছেন। তাঁর সাথে দেখা হবেই চাঁপা আশ্বস্ত হয়। তবু ধৈর্যের যেন বাধ ভেঙ্গে যায়- কখন দেখা হবে? দেখা পেলেই স্বামীর খোঁজ নেবে। কোথায় আছে? কিভাবে আছে? জানবে সে।

প্রভু বুদ্ধ তখন শ্রাবস্তীর মূলগন্ধকুটি-বিহারে কিছু দর্শনার্থীর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন।

কুটির বাইরে বসে থাকা এক ভন্তের কাছ হতে প্রভু বুদ্ধের অবস্থান ও পরিচয় জেনে নিয়ে মূলগন্ধকুটি বিহারের মুখ্য দেশনাগারে যায় চাঁপা। কিছু দর্শনার্থীকে মেঝেতে বসা দেখতে পায়। আর দেখতে পায় একজন সৌম্য পুরুষ একটু উঁচু আসনে উপদেশদানের শৈলীতে বসে আছেন। উরুবেলা হতে শ্রাবস্তী আসার পথে পথচারীদের মুখে প্রভু বুদ্ধের চেহারার যে বর্ণনা চাঁপা পেয়েছে, তার সাথে ইনার হুবহু মিল রয়েছে। ইনিই প্রভু বুদ্ধ- আর কেহ নন। এদিক ওদিক না দেখে, কে কি বলবে তোয়াক্কা না করে সোজা বুদ্ধের চরণে শরণাপন্ন হয় চাঁপা।

চাঁপা - প্রভু, আমায় রক্ষা করুন। শুনেছি আপনি সর্বজ্ঞ। শুনেছি আপনি দিব্য-দ্রষ্টাও। আপনি সবার সব সমস্যার সমাধানে সমর্থ।

বুদ্ধ - মা, হয়েছে কি তোমার? কোত্থেকে এসেছো? কিছু বলবে তো প্রথমে।

চাঁপা - কেন সবাই যে বলল আপনি সর্বজ্ঞ। আপনি দিব্যদ্রষ্টা।

বুদ্ধ - লোকে কত কিছু বলে। তোমার কথা তুমি বল।

চাঁপা - প্রভু বুদ্ধ, আপনি অনন্তজিনকে চেনেন কি?

বুদ্ধ - অনন্তজিনের প্রয়োজন কিসে?

চাঁপা - অনন্তজিন আমার স্বামীর বন্ধু। আমার স্বামী তাঁকে দেখতে

গেছে। সে অনেকদিন হল। স্বামী ফিরে আসছে না। বাড়ীতে ছোট্ট একটি ছেলে। ছেলে ভীষণ বাপ-প্রিয়। প্রভু বুদ্ধ, বলুন কোথায় গেলে, কি করলে স্বামীর দেখা পাব। স্বামীকে পেতে যা করতে হয় করব।

বুদ্ধ - তোমার স্বামীর উপকের সাথে প্রথম দেখা উরুবেলায় হয়েছিল। এর পর আবার এখানেই দেখা হয়। উপক সাধনার চরমাবস্থায় পৌঁছেছেন। তার যোগ্য হতে হলে তোমাকেও সাধনা-জগতে প্রবেশ করতে হবে।

প্রভু বুদ্ধের মুখে তার স্বামীর নাম শুনে চাঁপা তো একেবারে অবাক। তার উপর উরুবেলার কথা শুনে স্তম্ভিত। তার স্বামীর কথার সাথে মেল খাচ্ছে পুরোপুরি। চাঁপার মনে সন্দেহ জাগে- সে প্রভু বুদ্ধের কাছে এসেছে, না অনন্ত-জিনের কাছে। আবার চাঁপা ভাবে প্রভু বুদ্ধ তো সর্বজ্ঞ। দিব্যদ্রষ্টাও। হয়ত তিনি অনন্তজিনকেও চেনেন। প্রভু বুদ্ধ যদি উপকের সন্ধান বলে দেন তা হলে আর অনন্তজিনের পরিচয়ের প্রয়োজন কিসের?

বুদ্ধ - উপক থেকে থাকলে নিশ্চয়ই তার সাথে দেখা হবে।

চাঁপা - প্রভু বুদ্ধ বলুন, আমায় কি করতে হবে?

বুদ্ধ - এত কষ্ট সহ্য করে এতদূর থেকে এসেছো। আর একটু সহ্য করতে পারবে কি?

চাঁপা - কি বলছেন আপনি? এতো কিছুই নয়। আরও কষ্ট করার প্রয়োজন হলে তাও করব।

বুদ্ধ - তোমাকে বেশী কিছু করতে হবে না। কেবল একটাই কাজ করতে হবে। আমি যা বলি তা মন দিয়ে শোনো, আর সেভাবে করো।

চাঁপা - বলুন, ভন্তে ভগবান।

চাঁপার কোন আধ্যাত্মিক পৃষ্টভূমি নেই। তার শুধু স্বামীর প্রতি প্রেম রয়েছে। কাজেই একেবারে প্রারম্ভিক কথা হতে আরম্ভ করে আনুপূর্বিক ধর্মদেশনা শোনাতে হবে। এটা বুঝতে পেরে- ভগবান বুদ্ধ দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা, পঞ্চকামগুণের দুষ্পরিণাম ও নৈষ্ক্রম্যের সুপরিণাম সম্পর্কে সুন্দর ধর্মদেশনা শোনান চাঁপাকে।

চাঁপার জীবনে কারও ধর্মকথা শোনার অবসর এই প্রথম এল। তাও আবার সর্বজনন্দিত বুদ্ধের মুখে। সরল তাঁর ভাষা। হৃদয়স্পর্শী তাঁর শৈলী। প্রতিটি শব্দ যেন কর্ণকুহর হতে মরমে প্রবেশ করে। শাস্তার ধর্মকথা শোনার কি অদ্ভূত পরিণাম। চাঁপার মন যেন অনেকটা শান্ত হয়েছে। পূর্বাপেক্ষা তার মন অনেকটা নমনীয় ও কোমল হয়েছে জেনে এবার শাস্তা ধর্মদেশনার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেন।

বুদ্ধ - এখানে এ অবধি যা পেয়েছ, তার চেয়েও ঢের বেশী এখনও পাবার রয়েছে। আর সব রয়েছে তোমার মধ্যে। আর তা তোমাকেই খুঁজে পেতে হবে। আমি শুধু মাত্র একজন পথপ্রদর্শক। তা যদি তোমার কাম্য হয়ে থাকে তবে তোমাকে স্মৃতি-সাধনা করতে হবে।

চাঁপা - এই স্মৃতি-সাধনা কি বা কাকে বলে?

বুদ্ধ - শাস্ত্রীয় ভাষায় একে বলা হয় স্মৃতি-উপস্থাপন (**সতিপট্ঠান**)। বিপশ্যনাও (**বিপস্সনা**) একে বলা হয়। ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক প্রতিটি কাজকে জেনে জেনে করাটাকে স্মৃতি-সাধনা বলে। জানাটাই স্মৃতি।

চাঁপা - প্রভু বুদ্ধ, এই স্মৃতি-সাধনার লাভ কি?

বুদ্ধ- স্মৃতি-সাধনায় মন শুদ্ধ হয়। মনের সংকল্প-শক্তি বাড়ে। মন

মানুষের বশীভূত হয়। অসীম সুখ ও শান্তির সে অধিকারী হতে পারে।

চাঁপা - বলুন, তা হলে, প্রভু। কিভাবে স্মৃতি-সাধনা করতে হয়?

বুদ্ধ - স্মৃতি-সাধনার শুরু আনাপানকে আলম্বন করে করতে হয়। আশ্বাস নেওয়াকে 'আন' আর প্রশ্বাস ছেড়ে দেওয়াকে 'অপান' বলা হয়। কাজেই আশ্বাস-প্রশ্বাসের দুই কাজকে একত্রে 'আনাপান' বলা হয়।

চাঁপা - আশ্বাস-প্রশ্বাস (আনাপান) তো আমরা সব সময়ই নিয়ে থাকি। এতে আবার কষ্ট কিসের?

বুদ্ধ - সুস্থ দেহে আশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজটা কষ্টকর নয়। অনায়াসেই হয়ে থাকে। অসুস্থ দেহে আশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়াটাও কষ্টপ্রদ হয়। তার চেয়েও কষ্টপ্রদ হয় জেনে জেনে স্মৃতি-সহকারে আশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া। প্রাণীরা আর বিশেষত সাধারণ মানুষেরা নানাধরণের কাজ করে বটে, তবে কাজের করার সময় জানা থাকে না যে কোন বিশেষ কাজ করার কারণে তাকে বা তাদেরকে এত দুঃখ সইতে হয়। পরে তাকে অনুতাপ-পশ্চাত্তাপ ভোগ করতে হয়। জেনে জেনে স্মৃতি-সহকারে কাজ করাটা জ্ঞানীর ও জ্ঞানের লক্ষণ। অজান্তে কোন কাজ করাটাই অজ্ঞানীর লক্ষণ। তা নয় কি?

চাঁপা - হ্যাঁ ভগবান, না জেনে করাটাই অজ্ঞানীর অজ্ঞানের লক্ষণ। আর জেনে জেনে করাটাই জ্ঞানের ও জ্ঞানীর লক্ষণ।

বুদ্ধ - কর্মস্থান-গ্রহণ করার প্রস্তুতি নাও, তা হলে। সুখাসনে মেরুদণ্ড ও মাথা সোজা রেখে বস। হাত দুটোকে নাভির নীচের ভাগে দুই পায়ের সন্ধিস্থলে রাখ। বাম হাতের তালুতে ডান হাতের তালু রাখ।

শক্ত-ভাবে নয়। আলতো ভাবে।

চাঁপা - হ্যাঁ, ভন্তে ভগবান। যেভাবে বললেন তা করলাম। এখন আর কি করতে হবে?

বুদ্ধ - এবার মনকে দুই নাসিকা-ছিদ্রের মাঝামাঝিতে আন।

চাঁপা - মনকে কি করে ধরব?

বুদ্ধ - আশ্বাস-প্রশ্বাস নেবার (আনাপান করার) সময় নাসিকাছিদ্রে এক প্রকারের সূক্ষ্ম অনুভূতি হয়। তাকে অনুভব করার চেষ্টা কর।

চাঁপা - হ্যাঁ ভন্তে, তাও করলাম।

বুদ্ধ - প্রতিটি আশ্বাস আর প্রশ্বাসের গতি ও আকারের পরিবর্তন হয়। কোনটি আকারে ছোট হয়। আর কোনটি বড় হয়। কোন সময় আশ্বাস-প্রশ্বাস খুব তাড়াতাড়ি হয়। আবার কখনও খুবই ধীরে হয়। এদের পরিবর্তনের সাথে অনুভূতিরও পরিবর্তন হয়। আনাপানের এই সব অনুভূতিকে জানতে হবে। আশ্বাস-প্রশ্বাসের অর্থাৎ এ দুইয়ের অনুভূতির আদি, মধ্য ও অন্ত- এ অবস্থা তিনটিকে জানতে হবে। আশ্বাস নেবার সময় 'আশ্বাস নিচ্ছি' আর প্রশ্বাস ফেলার সময় 'প্রশ্বাস ফেলছি' জানতে হবে। আশ্বাস নেবার সময় 'প্রশ্বাস নিচ্ছি' বা প্রশ্বাস ফেলার সময় 'আশ্বাস ফেলছি ' বলে যেন জানা না হয়। অর্থাৎ তোমার একটি মাত্র কাজ- যখন যা তখন তা জানবে। আর এক সময় এক কাজ করবে।

চাঁপা স্মৃতি-সাধনা করতে শুরু করে। শ্রদ্ধা ও একাগ্রতার সাথে সে করতে থাকে। অল্প-ক্ষণ স্মৃতি-সাধনা করতেই মনে হল তার চোখের সামনে দেহের ভেতরকার নাড়ি-ভুড়ি, মল-মূত্র সব অশুভ তত্ত্ব একে একে ভেসে উঠেছে। নিজেকে জিজ্ঞেস করেই এ সুন্দর দেহে কি

এসব ঘৃণ্য তত্ত্ব রয়েছে? তা হলে এ দেহকে সুন্দর কেন ভাবি? এসব ভাবা-কালে চাঁপার মনে পড়ে প্রভু বুদ্ধের নির্দেশবাণী। 'যখন যা তখন তা' জানা আর 'এক সময় এক কাজ করা'। স্মৃতি না করে সে তো অন্য কিছু চিন্তা করছে। সংবেগ ফিরিয়ে এনে- ঘৃণ্য তত্ত্ব দেখা কালে 'দেখছি, দেখছি' বলে জানতে থাকে। ঘৃণা উৎপন্ন হবার কালে 'ঘৃণা উৎপন্ন হচ্ছে' জানতে থাকে। এ ভাবে স্মৃতি-সাধনা কালে একবার তার মনে হলো যেন- ঐ সব অশুভ-তত্ত্ব হতে এক অসহনীয় পঁচা দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। 'গন্ধ পাচ্ছি, গন্ধ পাচ্ছি' জানতে থাকে সে। কিন্তু অসহনীয় হওয়ায় একবার ইচ্ছে হয়েছিল- হাত তুলে নাক-মুখ বন্ধ করার। আবার শাস্তার নির্দেশ মনে পড়ে। 'গন্ধ পাচ্ছি, গন্ধ পাচ্ছি' বলে জানতে থাকে। দুর্গন্ধ তীব্রতর হওয়ার সাথে শরীরের প্রতি তার ঘৃণা (বৈরাগ্য) ভাব জাগে। বৈরাগ্য-ভাব উদয় হলে 'বৈরাগ্যভাব উদয় হয়েছে' জানতে থাকে। এভাবে মন তার ক্রমশ স্থূল আলম্বন ছেড়ে সুক্ষ্ম আলম্বনে বিচরণ করতে থাকে। একে একে মানসিক জগতের বিকার-বিকৃতিগুলো মানস-চোখে ভেসে ওঠে। স্মৃতি-সহকারে সে সব জানে। তাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয়-সম্পর্কে সে সব প্রত্যক্ষ অনুভব করছে। স্মৃতি-সহকারে জানায় 'নতুন প্রদূষিত মানসিক অবস্থার বিনাশ হচ্ছে' - সে জানতে পারে। নতুন প্রদুষণকারী মানসিক প্রবৃত্তির উৎপত্তি না হবার অবস্থাও সে স্মৃতি-সহকারে জানে। তার মানস-জগত পরিশুদ্ধ হয়। মন তাঁর সব বন্ধন হতে মুক্ত হয়। পরম শান্তির সুখানুভূতি তার হয়। স্থির দেহ ও মনে চাঁপা অনেকক্ষণ ঐ অবস্থাতেই বসে থাকে। হঠাৎ তার যেন মনে হতে থাকে- সে নানা প্রকারের ভার হতে মুক্তি পেয়েছে। তিনি বুঝতে পারেন তার যা করণীয় ছিল তিনি তা পূর্ণত পালন করেছেন। আর তার করার কিছুই নেই। তিনি বন্ধন-মুক্ত হয়ে বিমুক্তির সন্ধান পেয়েছেন। উপকের কথা

মনে পড়ায় চাঁপা শাস্তার কাছ হতে জানার প্রস্তুতি নেয়। শাস্তা বুদ্ধও তা জানেন। অনুকুল পরিস্থিতি জেনে শাস্তা উপকের ব্যাপারে সব কিছু বিস্তৃতাকারে বলে দেন। চাঁপা প্রকৃতিস্থ হয়ে সব শোনেন। মহাস্থবির উপকের প্রতি প্রণাম জানান। শেষে চাঁপা দুই হাত জুড়ে মাথা নুইয়ে সশ্রদ্ধচিত্তে বুদ্ধের প্রতি প্রণাম জানিয়ে আবার বলেন-

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
সংঘং সরণং গচ্ছামি।

দুতিয়ম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
দুতিয়ম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
দুতিয়ম্পি সংঘং সরণং গচ্ছামি।

ততিয়ম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ততিয়ম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
ততিয়ম্পি সংঘং সরণং গচ্ছামি।।

সহায়ক-গ্রন্থ-সূচী

১। জাতক

২। থেরগাথা-পালি

৩। থেরীগাথা-অট্‌ঠকথা

৪। দিব্যাবদান

৫। ধম্মপদট্‌ঠকথা

৬। পটিসম্ভিদামগ্গ

৭। পপঞ্চসূদনী

৮। বুদ্ধবংস-অট্‌ঠকথা

৯। মধ্যমনিকায়

১০। মহাবগ্গ (বিনয়পিটক)

১১। সারত্থ-দীপনী-টীকা

১২। সুত্তনিপাত-অট্‌ঠকথা

১৩। সংযুক্ত-নিকায়

১৪। Cha»»ha Sa¶gåyana CD-ROM Version 3
Published by:
Vipassana Research Institute, Dhammagiri,
Igatpuri, Maharashtra 422403

১৫। Dictionary of Påli Proper Names Vol. 1

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

নাম	ঃ	ড. ভিক্ষু সত্যপাল
পিতার নাম	ঃ	বিনোদ বিহারী বড়ুয়া
মাতার নাম	ঃ	শ্রীমতী যুথিকা রাণী বড়ুয়া
জন্ম স্থান	ঃ	হলদিবাড়ী চা বাগান জলপাইগুড়ি (প. ব.)
জন্ম তারিখ	ঃ	০১. ০৩. ১৯৪৯

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ত্রিপিটক বিশারদ (স্বর্ণ-পদক প্রাপ্ত)
এম. ফিল., পি. এইচ. ডি. (দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়)

পেশা ঃ অধ্যাপনা, বৌদ্ধ অধ্যয়ন বিভাগ
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮১ হতে -)
বর্তমানেঃ বিভাগীয় প্রধান

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ (১) তেলকটাহগাথা (বঙ্গানুবাদ সহ)
(২) খুদ্দক-পাঠ (ইংরেজী ও হিন্দী অনুবাদ সহ)
(৩) কচ্চায়ণ-ন্যাস (১ম ভাগ)
(৪) ধম্ম-সংগহ (১ম ভাগ)
(৫) বাবাসাহেব ড. আম্বেদকর,
(৬) বৌদ্ধ ভারত ও পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজ
(৭) শরণ-গ্রহণের পরম্পরা

গ্রন্থ-সম্পাদনা ঃ (১) 'মৈত্রী' স্মরণিকা (১৯৮২)
(বুদ্ধ ত্রিরত্ন মিশন, দিল্লী)
(২) 'ভিক্ষু-পরিবাস' স্মরণিকা (১৯৮৯)
(ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা)।
(৩) 'ধম্মচক্কং' স্মরণিকা (১৯৯৩ - ২০০৯)
(বুদ্ধ ত্রিরত্ন মিশন, দিল্লী)
(৪) 'The Buddhist Studies' –Journal of
Department of Buddhist Studies
University of Delhi, Delhi - 110007

প্রকাশনার অপেক্ষায় (গ্রন্থ ও নিবন্ধ) ঃ ২০ টির পাণ্ডুলিপি তৈরী
(বাংলা, ইংরেজী ও পালি ভাষায়)

2. Buddher Divya Dṛiṣṭi (The Divine Eye of the Buddha)

Āajivaka Upaka

The content of this text is based on the conversation that took place in between the Buddha and a wandering monk known as Āajivak Upaka.

The Vinaya Pitaka mentions, Buddha, after the attainment of supreme Enlightenment (Sambodhi) under the Bodhi tree at Urvelā near the bank of Niranjanā river, first decided to deliver the first discourse to his former five disciples who were then staying in Ishipatana, near by the Varanasi. He could go directly to the Ishipatana but he did not go. He started his journey towards Gaya and he had a plan to reach Ishipatana via Gaya. The Buddha never does anything meaninglessly. Whatever he does, says, he select a way that which is more and more beneficial to the maximum people. The Buddha knows that if he follows this path he will meet someone. As per his divine eye he met one wandering monk on the way, in between Gaya and Urvela. That wandering monk was coming from Gaya to Urvela and the Buddha was going to Ishipatana via Gaya. The wandering monk was very amazed by seeing Buddha's by seeing Buddha's divine complexion, because he never saw a monk with such a divine personality. Naturally, he stopped his journey and asked the Buddha, "who are you?", "Who is your teacher?", "What *dhamma* you follow?". To answer all these questions put forth by Aajivaka Upaka the Buddha uttered one simple *gāthā* and he answered his all questions very precisely. He mentioned I do not have any teacher, I am all knower, I have controlled my faculties, I am unparallel on the earth, no one can challenge me, no one is equal to me and no one is worthy of my honor. I am the only Arahant. Then that wander monk asked "Where are you going now?" The Buddha answers, I am going to Kāsi to deliver the *dhamma* and to set the wheel of religion into motion, and the Buddha did not give any discourse to him. Just after uttering the *gāthā* (verse) the Buddha proceeded to Ishipatana and the wandering monk proceeded to Ishipatana. Near Urvela the wandering monk met one hunter. The hunter requested the monk to stay in his hut and take rest, spent one night. The wandering monk accepted his request. That hunter had one daughter, her name was Capa. She was very beautiful. The monk Upaka had fallen in love with her and with the permission of Capa they married and started living there together. After few years of married life they had a son, but the family relationship between them became weak and bitter. The wife always blames the husband to be the most black person. In this situation the Upaka decided to leave the wife and first he went to Urevela and then to Ishipatana. He practiced mediation under the instruction of the Buddha and attained Arahanthood. In search of her husband the wife also left the house, finally she found her husband in the Buddha's *Sangha*. She also joined the *Sangha* and practiced the *dhamma* and attained Arahanthood. This is the content of the book.

"Wherever the Buddha's teachings have flourished,

either in cities or countrysides,

people would gain inconceivable benefits.

The land and people would be enveloped in peace.

The sun and moon will shine clear and bright.

Wind and rain would appear accordingly,

and there will be no disasters.

Nations would be prosperous

and there would be no use for soldiers or weapons.

People would abide by morality and accord with laws.

They would be courteous and humble,

and everyone would be content without injustices.

There would be no thefts or violence.

The strong would not dominate the weak

and everyone would get their fair share."

~THE BUDDHA SPEAKS OF
THE INFINITE LIFE SUTRA OF
ADORNMENT, PURITY, EQUALITY
AND ENLIGHTENMENT OF
THE MAHAYANA SCHOOL~

Taking Refuge with a mind of Bodhichitta

In the Buddha, the Dharma and the Sangha,
I shall always take refuge
Until the attainment of full awakening.

Through the merit of practicing generosity
and other perfections,
May I swiftly accomplish Buddhahood,
And benefit of all sentient beings.

The Prayers of the Bodhisattvas

With a wish to awaken all beings,
I shall always go for refuge
To the Buddha, Dharma, and Sangha,
Until I attain full enlightenment.

Possessing compassion and wisdom,
Today, in the Buddha's presence,
I sincerely generate
the supreme mind of Bodhichitta
For the benefit of all sentient beings.

"As long as space endures,
As long as sentient beings dwell,
Until then, may I too remain
To dispel the miseries of all sentient beings."

With bad advisors forever left behind,
From paths of evil he departs for eternity,
Soon to see the Buddha of Limitless Light
And perfect Samantabhadra's Supreme Vows.

The supreme and endless blessings
of Samantabhadra's deeds,
I now universally transfer.
May every living being, drowning and adrift,
Soon return to the Pure Land of Limitless Light!

*** The Vows of Samantabhadra ***

I vow that when my life approaches its end,
All obstructions will be swept away;
I will see Amitabha Buddha,
And be born in His Western Pure Land of
Ultimate Bliss and Peace.

When reborn in the Western Pure Land,
I will perfect and completely fulfill
Without exception these Great Vows,
To delight and benefit all beings.

*** The Vows of Samantabhadra Avatamsaka Sutra ***

DEDICATION OF MERIT

May the merit and virtue
accrued from this work
adorn Amitabha Buddha's Pure Land,
repay the four great kindnesses above,
and relieve the suffering of
those on the three paths below.
May those who see or hear of these efforts
generate Bodhi-mind,
spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
and finally be reborn together in
the Land of Ultimate Bliss.
Homage to Amita Buddha!

NAMO AMITABHA

南無阿彌陀佛

《孟加拉文：BUDDHER DIVYA DRISTI
(THE DIVINE EYE OF THE BUDDHA) O AJIVAKA UPAKA,
佛陀的天眼通和修行者烏巴卡》
財團法人佛陀教育基金會 印贈
台北市杭州南路一段五十五號十一樓
Printed and donated for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website: http://www.budaedu.org
This book is strictly for free distribution, it is not for sale.
এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।
Printed in Taiwan
7,000 copies; April 2013
BA044 - 11144